বনবিবির বনে

বুদ্ধদেব গুহ

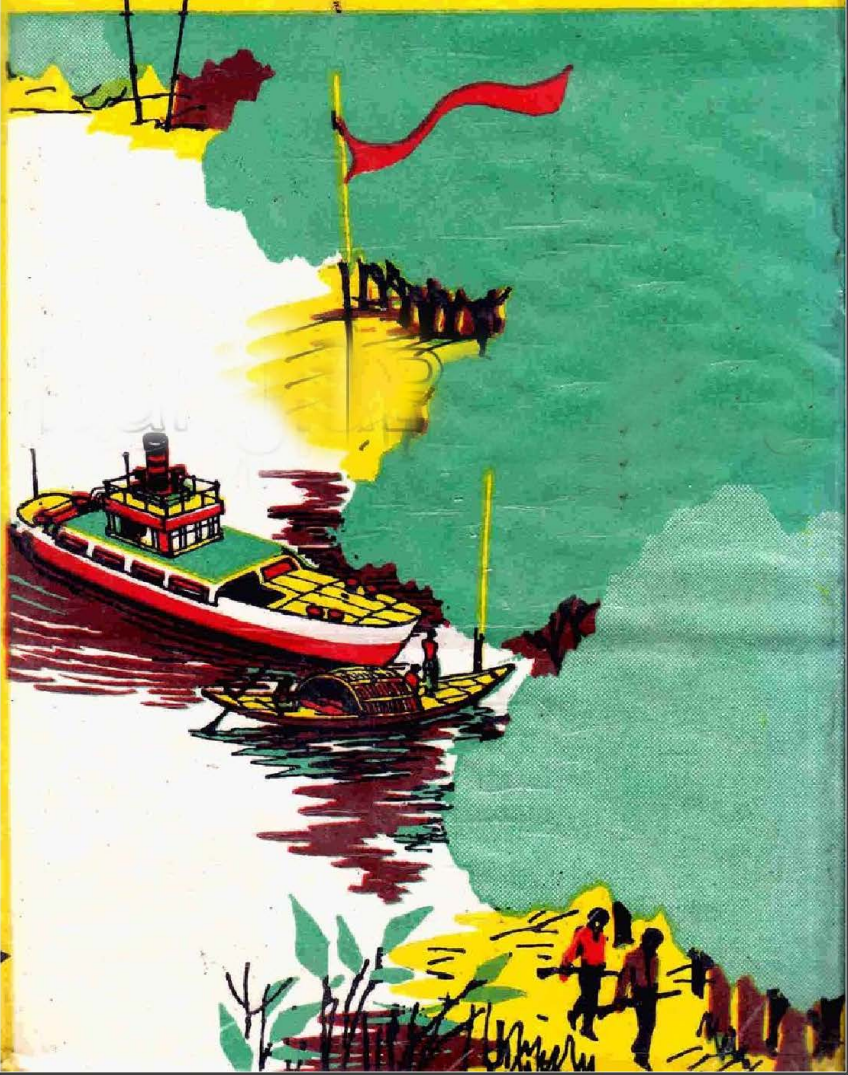

বনবিবির বনে

বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

bengaliboi.com

প্রথম সংস্করণ অগাস্ট ১৯৭৯ **প্রচ্ছদ ও অলংকরণ** সুধীর মৈত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

সোহিনী সোনাকে

bengaliboi.com

bengaliboi.com

এই লেখকের অন্যান্য বই

মউলির রাত

ঋজুদার সংগে জঙ্গলে

আন্তর্জাতিক
শিশুবর্ষে
আনন্দ-উপহার

১

সুন্দরবনের ছোট বালির পাশে মোটর-বোটটা নোঙর করা আছে।

সোঁদরবনের মানুষখেকো বাঘের জন্যেই এবার আসা।

মায়ের প্রচুর আপত্তি ছিল আমাকে আসতে দিতে, কিন্তু বাবার পারমিশানে মায়ের অনিচ্ছা ওভাররুল্‌ড হয়ে গেছিল। অবশ্য ঋজুদার সঙ্গে না এলে বাবাও সুন্দরবনে আসতে দিতেন কিনা সন্দেহ।

ক্যানিং থেকে রাতে বোটে রওনা হওয়া হয়েছিল। সারারাত বোট

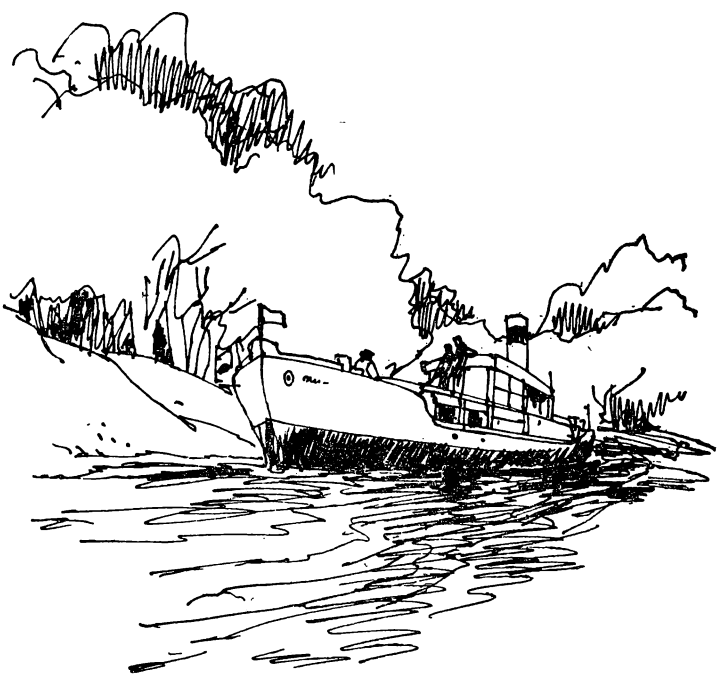

চালিয়ে পরদিন দুপুরে চামটার কাছে এসে নোঙর করেছি আমরা। সারেঙ ও মাল্লাদের বিশ্রাম ও আমাদের সকলের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে। তারপর বিকেল-বিকেল বোট ছেড়ে গভীর রাতে ছোট বালিতে এসে পৌঁছেছিলাম।

বাউলে, মউলে ও জেলেদের নৌকাগুলো মাঝে মাঝে গহীন দুপুরে এসে লাগে এই ছোট বালিতে। তারপর মুখে উলু দেওয়ার মতো অদ্ভুত আওয়াজ করে জলের কলসি নিয়ে মিষ্টি জলের কুণ্ড থেকে জল তুলে নিয়ে যায় ওরা বড় ভয়ে-ভয়ে। বাঘ যে কোথায় কখন এসে হাজির হবে, তা কেউই জানে না। বনবিবির পুজো দেয় ওরা, বাবা দক্ষিণরায়ের। পায়রা কি পাঁঠা বলি দেয় ঠাকুরের নামে। কোঁচড় ভরে আছাড়ি পটকা নিয়ে ডাঙায় নামে।

কিন্তু সুন্দরবনের বাঘের কাছে এ-সবই আকর্ষণ। বাঘকে দূরে না পাঠিয়ে মানুষের গলার স্বর, আছাড়ি পটকার শব্দ আরও কাছে টানে। মৃত্যুর কাছে।

বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। ঋজুদাই বলছিল, সুন্দরবনে তো এই নিয়ে বহুবার এলাম গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে; কিন্তু শীতকালে এমন বৃষ্টি কখনও দেখিনি।

বোট থেকে নেমে যাবোই বা কোথায়? বোটের খোলা ডেকেও বসা যায় না। হয় সারেঙের বসার জায়গার পিছনে যে জায়গাটুকু আছে সেখানে বসে আড্ডা মারি আমরা, নয়তো খোলের মধ্যে। অবশ্য এ বোটটা ভাল। ছোট্ট। দুটো কেবিন আছে, সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। যদিও সুন্দরবন অন্য জঙ্গল নয় যে, ইচ্ছেমতো ঘুরে-ফিরে বেড়াব পায়ে হেঁটে, তবুও কার আর ভাল লাগে টিপ্‌টিপে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় বোটের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে?

খিচুড়ি খাওয়ার এমন পরিবেশ বোধহয় আর হয় না। খিচুড়ি খাও আর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুম লাগাও।

বোট খুলে নিয়ে এই দুর্যোগে হেড়োভাঙা কি গোসাবা কি মাতলা নদীতে গিয়ে পড়ার বিপদও অনেক। ট্রান্‌জিস্টরে বলেছে যে, তিনদিন অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলবে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। আর আমরাও চলে এসে রয়েছি একেবারে বঙ্গোপসাগরের মুখেই।

ঋজুদা বোটটাকে একটা সুঁতিখালের মধ্যে দিনের বেলা ঢুকিয়ে রাখতে বলেছিল। রাত হলে আবহাওয়া বুঝে অন্য জায়গায় নতুন নোঙর করা যাবে। রাতের বেলা সুঁতিখালে নোঙর-করে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক এই মানুষখেকো বাঘে-ভরা সুন্দরবনে। অবশ্য রাতের বেলা আমরা ম্যাগাজিনে গুলি পুরে চেম্বার ফাঁকা রেখে রাইফেলকে প্রায় কোলবালিশ করেই শুয়ে থাকি। ঋজুদা হাসতে হাসতে একরাতে বলছিল, রাইফেল-কোলে ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘের পেটে গেলে সে বড়ই বেইজ্জতি হবে।

একই জায়গায় প্রথম দিন প্রথম রাত এইভাবে কাটার পর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ঋজুদাকে বললাম, ঋজুদা, সঙ্গে আমি টেপ রেকর্ডার এনেছি, বাঘের ডাক, হরিণের ডাক টেপ করার জন্যে। যা দুর্যোগ! বাইরে তো বেরোতেই পারছি না, তার চেয়ে তুমি গল্প বলো, আমি টেপ করি।

ঋজুদা সবটাতেই ইয়ার্কি মারে। বলল, আর হনুমানের ডাক টেপ করবি না?

আমি বললাম, না।

ঋজুদা বলল, গভীর জঙ্গলে হনুমানের ডাক যারা শোনেনি,

তারা ঐ ডাক শুনেই বাঘ বলে ভাববে। তুই সেফ্‌লি হনুমানের ডাক টেপ করে নিয়ে যা। যা ঠাণ্ডা আর বৃষ্টি, বাঘেদের গলা ভাল না-থাকারই কথা। যদি না ডাকে, আর ডাকলেও, তাদের পারমিশান্ না নিয়ে টেপ করলে আপত্তি করতে পারেই; তার চেয়ে যা বললাম, তাই-ই কর।

তারপরই বলল, একবার উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের গভীরে এক গ্রামে গরু ডাকছিল, সেই ডাক টেপ করেছিলাম। আমার কলকাতার দাদার এক ব্যারিস্টার বন্ধু নাকি খুব শিকার-টিকারে যেতেন আর আলো-জ্বলা ড্রইংরুমে বসে দাদা-বৌদির কাছে হাত নেড়ে, কান নেড়ে দুর্ধর্ষ সব শিকারের গল্প করতেন।

একদিন তিনি যখন এসেছেন, দাদা-বৌদির কাছে, আমি টেপটা বাজালাম।

জাঁদরেল গরু তার বাজখাঁই গলায় ডাকছিল হাম্বা—আ—আ। গভীর জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টিভেজা গাছপালার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে ডাক গম্‌গম্ করে উঠছিল।

দাদার ব্যারিস্টার বন্ধু মনোযোগ দিয়ে ডাকটা শুনলেন বারকয়েক, তারপরই বৌদির দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বললেন, বুঝলে?

কী বুঝলে ম্যাডাম?

বৌদি চোখ বড় বড় করে বললেন, কী? কোন্ জানোয়ার? কুমির?

ব্যারিস্টার-দাদা বললেন, ধুৎ, কুমিরের ডাক আন্‌ক্যানি। এটা বাঘিনীর ডাক। সঙ্গীকে ডাকছে।

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, হেসো না। জঙ্গলের ভিতরের গ্রামের গরুর হঠাৎ-ডাক ফেল্‌না নয়।

আমি বললাম, ঋজুদা, এই করে কিছুই হচ্ছে না। সময় চলে যাচ্ছে। আমি কিন্তু টেপ করছি, তুমি গল্প বলো; তোমার নানান জায়গায় শিকারের গল্প।

ঋজুদা পাইপটা থেকে ছাই ঝেড়ে বলল, বলিস কী? আমি কি জিম করবেট? বেশি গ্যাস্ দিস না আমাকে। তোকে তো এমনিতেই সব জায়গায় নিয়ে আসি। তবে আর কেন? আমার আবার গল্প, তাও আবার টেপ্ করবি। আর লোক পেলি না?

আমি বললাম, তুমি কথা ঘোরাচ্ছ। যতদিন···মানে এই দুদিন তো দুর্যোগে বোটের মধ্যেই আটকা···বলোই না বাবা। প্লীজ, তুমি বলো। তোমারও পুরনো কথা সব মনে পড়ে যাবে—আর আমারও শোনা হবে গল্প।

তারপরই কী মনে হওয়ায় আমি বললাম, তাহলে, তোমার জেঠুমণির গল্প বলো। দারুণ লেগেছিল সেই কানা-বাঘের গল্পটা। তোমার আর তোমার জেঠুমণির যা-যা মজার-মজার গল্প আছে, সব বলো, প্লীজ।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে, আমাকে বলল, গদাধরকে বল তো চায়ের জল চড়াবে। আর হ্যাঁ, সঙ্গে পাঁপড় ভাজতে বল। তারপর বলল, আজ রাতে ভুনি-খিচুড়ি পেলে কেমন হয় বল তো? বাদাম কড়াই-শুঁটি ছাড়িয়ে, মুগের ডালের খিচুড়ি, একটু ঘন করে, সঙ্গে ডিমের বড়া, পেঁয়াজি আর শুকনো-লঙ্কা ভাজা করবে!

আমি বলে উঠলাম, আঃ। আর বোলো না, আর বোলো না, গন্ধ পাচ্ছি।

ঋজুদা বলল, পাচ্ছিস গন্ধ! তাহলে বলেই আয় গদাধরকে। শুকনো-কড়াইশুঁটি কি আছে আমাদের সঙ্গে?

আমি বললাম, সব আছে। নেই কী! তুমি তো জেঠুমণিরই ভাইপো। তুমিই বা কম কী?

ঋজুদা বলল, ফার্স্ট ক্লাস। গদাধরকে চায়ের কথাটাও বলে দিয়ে চলে আয় দেখি। এক চামচ চিনি, দুধ কম; মনে আছে তো?

আমি বললাম, শুধু আমার কেন, আমার বন্ধুদেরও মুখস্থ হয়ে গেছে যারা তোমার বই পড়েছে। তুমি বেশ খাদ্যরসিক আছ বাবা। আমার এক বন্ধুর মা বলেছেন।

ঋজুদা বলল, যাঃ ভাগ্। বলেছেন তো বলেছেন। তা বলে ভাল-ভাল জিনিস খাব না?

রাতের খাওয়ার অর্ডার আর চায়ের কথা বলে আমি ফিরে এসে আসন করে বসলাম সারেঙের ঘরে পাতা গদিতে একটা বালিশ কোলে নিয়ে।

ঋজুদা দূরে তাকিয়ে ছিল। জলের উপর দিয়ে এক ঝাঁক কার্লু উড়ে যাচ্ছিল দ্রুত ডানায়। খালের ওপার থেকে হরিণগুলো ডাকছিল টাঁউ-টাঁউ করে।

ঋজুদার চোখে তাকিয়ে আমার সমস্ত মনটাও যেন প্রশান্ত হয়ে এল। এই সুন্দরবনের নির্জন, ভিজে, ভয়-ভয়; অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন ঋজুদার চোখে ক্যামেরার লেন্সের মতো ছায়া ফেলেছে। বড় ভালবাসে প্রকৃতিকে মানুষটা! ভাবলেও ভাল লাগে। আমি যদি কমপিটিটিভ্ পরীক্ষায় বসি বড় হয়ে, তাহলে ফরেস্ট সার্ভিসে যাব। যে একবার জঙ্গলের আর প্রকৃতির কাছে থেকেছে, সে কি জঙ্গল ছেড়ে থাকতে পারে?

ঋজুদা যখন চোখ ফেরাল বাইরে থেকে, আমি বললাম, বলো ঋজুদা।

ঋজুদা যেন অনেক দূরে চলে গেছিল। এই বৃষ্টি-ভেজা নদী, জঙ্গল, দূরে ঝাপসা দিগন্তের বঙ্গোপসাগরের দিকে চেয়ে ঋজুদা যেন অন্য কারো কথা ভাবছিল। অথবা প্রকৃতির মধ্যেই বোধহয় ঋজুদা কাউকে দেখতে পায়, বুঝতে পারি না। কাছাকাছি থেকেও ঋজুদাকে মাঝে-মাঝে একেবারেই বুঝতে পারি না। কিছুক্ষণের জন্যে দূরে—বড়ই দূরে চলে যায়। তখন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কী যেন গভীর দুঃখ কাজল হয়ে তার চোখে চোখে লেগেছে।

আমি বললাম, শুরু করো।

ঋজুদা আমার কাছে ফিরে এল। আবার সেই হাসিখুশি, রসিক মানুষটা।

বলল, শোন্ তাহলে, শুরু করি। তারপর বলল, তুই একটা দামি কথা বলেছিস: গল্প বলতে-বলতে আমারও অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যাবে। ছেলেবেলায় ফিরে যাব। এটা কম কথা নয়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার নিজের গল্প নাই-ই বা শুনলি; ইচ্ছে আছে, পরে কখনও ডায়রির মতো করে লিখব। তার চেয়ে জেঠুমণির গল্পই শোন।

ঋজুদা গল্প বলতে শুরু করল···

জেঠুমণি কলকাতার নামজাদা ব্যারিস্টার। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় তাঁর সব বড় বড় মক্কেল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। একবার যাব বললেই হল। খাতির-যত্ন, আদর-আত্তির অভাব নেই। তবে বিগ-গেম্ শুটিং-এর শখ জেঠুমণির মাঝ-বয়সে হয়। তার আগে ফেদার-শুটিং করতেন। মানে পাখ্-পাখালি আর কী!

জেঠুমণির হাত ছিল দারুণ। বন্দুকে ফ্লাইং মারতেন পটাপট্। পাখি উড়েছে কি মরেছে। রাইফেলেও ভাল নিশানা ছিল জেঠুমণির।

পয়েন্ট টু টু ওপেন রাইফেল দিয়ে, ম্যাচ রাইফেল নয় ; পঁচাত্তর গজ দূরে আমি জেঠুমণিকে দেখেছি গ্যাঁদাফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়তে এক-এক করে।

সবচেয়ে বড় কথা ছিল এমন রসিক দিল-খোলা ও উদার লোক আমি কমই দেখেছি। মানুষজন ভালবাসতেন ভীষণ। যখনই শিকারে যেতেন, সঙ্গে যেত মস্ত দল। অনেকেই তাঁর শিকার-পার্টিকে তাই যাত্রা-পার্টি বলত। কিন্তু জেঠুমণি দমবার লোক ছিলেন না। সকলকে নিয়ে যা আনন্দ, তাতেই তিনি মজা পেতেন।

আমাকে জেঠুমণি খুব ভালবাসতেন ছোটবেলা থেকে। জেঠুমণির বড় ছেলে, মানে আমাদের বড়দা একটু কবি-কবি গোছের লোক ছিলেন। জেঠুমণি তাঁর নাম দিয়েছিলেন হোঁদল-কুত্‌কুত্‌। বড়দাদা শিকারে গিয়ে কবিতার খাতা নিয়ে বসতেন কি ছবি আঁকতেন। জেঠুমণি ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না, কিন্তু বড়দাদার কবিত্বের কারণে আমিই জেঠুমণির অনেক কাছের ছিলাম। বড়দাদা শিকার-টিকারে বড় একটা যেতেও চাইতেন না, তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুল কামাই হবে বলে।

জেঠুমণির এক বড় মক্কেল, বিশ্ববিখ্যাত মাইকা কোম্পানি, কোডারমার, জেঠুমণিকে নেমন্তন্ন করল শিকারে যেতে। ঝুম্‌রি-তিলাইয়ার উল্টোদিকে কোডারমা শহর। কোডারমা স্টেশন থেকে বেশ কিছু দূরে শিবসাগর। পুরোটাই ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানির এলাকা। তখন তাদের যে গেস্ট হাউস ছিল, তার নাম ছিল পাঁচ-নম্বর বাংলো। তখন সবে সাহেবরা কোম্পানি বিক্রি করে দিয়েছে এখনকার মালিকদের কাছে। বিরাট শালবন ছিল বাংলোর কম্পাউণ্ডে। বেয়ারা, বাবুর্চি, স্টুয়ার্ড, সহিস, ঘোড়া, গাড়ি, জীপ,

ওয়েপন-কেরীয়ার—কিছুরই অভাব ছিল না।

যথারীতি জেঠুমণি তাঁর বহু চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে একদিন সকালে তো কোডারমা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন। সঙ্গে দাশকাকু, অহীনকাকু, বক্সীকাকু, সমীরকাকু, গবুকাকু। আর আমি তো আছিই।

তখন শিকারও ছিল সে-সব জায়গায়। বিখ্যাত-বিখ্যাত সব জঙ্গল। ঢোঁড়াখোলা, শিঙ্গার, ইট্‌খোরি-পিতিজ্‌, রাজৌলির ঘাট, আরও কত কী জঙ্গল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া, হৈ হৈ। বিকেলে হাণ্ট্‌লি-পামার বিস্কিট দিয়ে চা খাওয়া হত। আহা! সেই বিস্কিটের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। গত বছর লণ্ডনে গিয়ে খেয়েছিলাম বহুদিন পর বুঝলি!

যাই-ই হোক, অহীনকাকু অন্য দলের লীডার হলেন। অহীন-কাকুর চেহারাটা ছোট-খাটো, কিন্তু অমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রসিক ও সাহসী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। তিনি বললেন, দাদা, আমি গবুদের নিয়ে রাজৌলির ঘাটে যাচ্ছি। আপনি দাশ সাহেবকে নিয়ে যান।

দলের মধ্যে দাশকাকুই সবচেয়ে সাহেব। যেমন সাহেবের মতো দেখতে, মুখে পাইপ, তেমনি আস্তে-আস্তে চোস্ত্‌ ইংরিজি-মেশানো বাংলা বলেন। ইন ফ্যাক্ট্‌, পাইপ খাওয়ার বাসনাটা আমার দাশ-সাহেবকে দেখেই হয় ছোট বেলায়—যদিও ভগবান চেহারাটা দাশ-সাহেবের মতো দেননি।

সবে বিয়ে করেছেন দাশকাকু। একটি ছেলে, এক বছর বয়স।

আসল ব্যাপার, দাশকাকু কট্টর সাহেব বলে অহীনকাকুরা তাঁকে জেঠুমণির জিম্মায় দিয়ে বিকেল-বিকেল বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ওয়েপন-ক্যারীয়ার দেখে মনে হল শিকার

তো নয়, যুদ্ধযাত্রায় চলেছেন তাঁরা।

জেঠুমণির স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার—জানোয়ার চেহারা দেখিয়ে যেন কোনোক্রমেই পালিয়ে না যেতে পারে। একসঙ্গে ফায়ারিং স্কোয়াডের মতো গুলি করে তাকে ধরাশায়ী করা চাইই চাই!

আমি, জেঠুমণি আর দাশকাকুর সঙ্গে জীপে বেরোলাম। অন্য দিকে। জেঠুমণি সামনে বসেছেন জীপের। ড্রাইভার মাহমুদ হুসেন। পিছনে আমি এবং দাশকাকু।

দাশকাকুর হাতে দোনলা শটগান। আমার হাতে পয়েন্ট টু-টু রাইফেল। জেঠুমণির হাতে পয়েন্ট ফোর-নট-ফাইভ সিংগল ব্যারেল রাইফেল। আণ্ডার লিভার। প্রত্যেকবার গুলি করে ঘ্যাটা-টং আওয়াজ করে নীচের লিভার টানাটানি করে রি-লোড করতে হয় রাইফেলকে।

জীপের পকেটে গোটা চল্লিশ মঘাই পান, আর খুশবুভরা জর্দা। শিকার যাত্রার আগে কোডারমা শহরে গাড়ি ছুটিয়ে গিয়ে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে যুগল এই পান নিয়ে এসেছে। যুগলই আমাদের গাইড, স্পটার; সব। তার চেহারাটা দারুণ। লম্বা চওড়া। গোঁফ আছে ইয়া বড়। শীত গ্রীষ্ম সব সময় তার পোশাক হল একটা গামবুট, তার উপরে একটা ওয়াটার-প্রুফ। শীতে অবশ্য ওয়াটার প্রুফের নীচে গরম পুলওভারও থাকত। মাথায় কোনো সাহেবের দিয়ে যাওয়া একটা নীল রঙা ফেল্ট-হ্যাট্।

জীপ ছাড়ল সন্ধের মুখে-মুখে। দেখতে দেখতে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম আমরা। শীতকাল।

জেঠুমণির ওজন দেড় কুইন্টাল—গায়ে মোটা কালো ওভারকোট—মাথায় বাঁদুরে টুপি। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই জেঠুমণি ঘাড় ঘুরিয়ে

কষ্ট করে দাশকাকুর সঙ্গে কথা বলছেন, কথা বলার সময় তাঁর মুখ দিয়ে রাশান সামোভারের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলি বেরোচ্ছে ঠাণ্ডায়। তার সঙ্গে দাশকাকুর থ্রী-নান টোব্যাকো-ঠাসা পাইপের স্টীম-বয়লারের মতো নিরন্তর ধোঁয়া। আরও ছিল যুগলের ঘন-ঘন দু হাতে খৈনি মেরে খাওয়া।

আমার তো প্রাণ যায়-যায়।

এমন সময় হঠাৎ ধূলিধূসর ঢোঁড়াখোলার পথে একটি নির্বোধ, প্রাণভয়হীন শশকের আবির্ভাব হল।

আমি বললাম, এই ঋজুদা, সংস্কৃত বোলো না, প্লীজ। আমি সংস্কৃতে পনেরো পেয়েছিলাম।

লজ্জার কথা। ঋজুদা বলল, শশক মানে খরগোশ, র‍্যাবিট, হেয়ার। বুঝলি তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।

ঋজুদা বলল, খরগোশ জীবনে হাজার হাজার দেখেছি, শয়ে শয়ে মেরেছি, কিন্তু ঐ খরগোশের কথা জীবনে ভুলব না। খরগোশটা বোধহয় খরগোশদের স্পোর্টসে থ্রি-লেগেড রেসে ফার্স্ট হয়েছিল। এমন অদ্ভুতভাবে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে তিন পা তুলে তুলে লাফাতে লাফাতে জীপের সামনে-সামনে দৌড়চ্ছিল যে কী বলব!

খরগোশ দেখেই যুগল বিরক্তির সঙ্গে বলল, মানহুস্।

মানহুস্ আবার কী ঋজুদা? আমি শুধোলাম।

আহা, মানহুস মানে জানিস না?

অধৈর্য গলায় ঋজুদা বলল।

মানহুস্ মানে অপয়া। শিকারে বেরিয়ে প্রথমে কী জানোয়ার পড়ে না পড়ে তার উপর নির্ভর করে সেদিনকার শিকারের ভাগ্য।

জায়গা বিশেষে এই পয়া-অপয়া বদলে যায়। কোথাও শেয়াল মানহুস্, কোথাও খরগোশ, কোথাও বনবেড়াল ; এইরকম আর কী।

আমি বললাম, বলো, তারপর বলো।

খরগোশ দেখে জেঠুমণি জীপের পকেট খুলে আরো চারটে পান মুখে দিলেন। তারপর রুপোর তৈরি মনোগ্রাম-করা জর্দার কৌটোটা হাতখানেক উঁচু করে উপর থেকে যেই মুখে জর্দা ফেলছেন টিপ্ করে, অমনি মাহমুদ হোসেন কী অনিবার্য কারণে ব্রেক কষল জীপের। ফলে, কাশীর জর্দা জেঠুমণির মুখে না পড়ে সটান আমারই উত্তেজিত হাঁ-করা মুখে! বোঝ্ একবার। স্পেশ্যাল বেনারসী জর্দা— বেনারস থেকে জেঠুমণির মক্কেল পাঠায় যত্ন করে।

কী হল বোঝার আগেই তো গিলে ফেললাম। তারপরই খেল্ শুরু। জীপ চলতে দেখি পথের উপরে একটা নয়, শত শত শশক। সামনে সামনে লাফাতে লাফাতে চলেছে।

জেঠুমণি অর্ডার দিলেন প্রধান অতিথিকে, মার্ দাশ।

দাশকাকু পাইপটা মুখে কামড়ে ধরেই চলমান জীপ থেকে লম্ফমান খরগোশের উদ্দেশে আই-সি-আই কোম্পানির তৈরি একটি চার নম্বরের ছররা দেগে দিলেন।

নৈবেদ্য যথাস্থানে পৌঁছল না। খরগোশটা বোধহয় বলল, খেলব না কিন্তু।

বলেই, জোরে একটা লাফ দিয়ে উঠেই আবার এক্কা-দোক্কা খেলার মতো জীপের সামনে লাফাতে-লাফাতে চলল। পথ ছেড়ে যে প্রাণ বাঁচাতে এদিকে কি ওদিকে জঙ্গলে ঢুকে যাবে তা নয়।

ছাড়িস না। আবার মার।

জেঠুমণির অর্ডার হল।

আবার গুলি হল। এবার বোধহয়, ভাল হচ্ছে না কিন্তু, বলে খরগোশটা একটা বড় লাফ দিয়ে উঠে যেমন চলছিল তেমনই লাফাতে-লাফাতে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে চলতে লাগল।

জেঠুমণি আবার বললেন, বেইজ্জত। পরক্ষণেই বললেন, মার, দাশ, ছাড়িস না।

দমাদ্দম গুলি হতে লাগল। দাশকাকু বন্দুক রিলোড করেন আর মারেন। খরগোশ লাফায় আর লাফায়, আর জীপের সামনে সামনে চলে।

জেঠুমণি নেহাত দাশকাকুর বেলাতেই এবং খরগোশের মতো ছোট জানোয়ার বলেই এমন একক শিকারের সম্মানের অধিকার দিয়েছিলেন। অন্য দল হলে এবং অন্য দিন হলে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে পড়ে খরগোশ ততক্ষণে কাবার হয়ে যেত।

এবার জেঠুমণি তাঁর সাধের ভাইপোকে বললেন, তুইও মার্, ঋজু।

কিন্তু আমি তখন কি আর ঋজু আছি? জর্দা খেয়ে বন্‌বন্ করে মাথা ঘুরছে। পথময় খরগোশ। ডানদিকে, বাঁদিকে; উপরে নীচে। বেনারসী জর্দাটা বড় কড়া ছিল।

কিন্তু জেঠুমণির অর্ডার। আমিও কর্তব্য করে যেতে লাগলাম, পটাং পটাং করে। ম্যাগাজিনের দশটা গুলি, দশটাই শেষ।

দাশকাকু গোটা দশেক গুলি করে দেখি ডান হাতের বাইসেপসের গোড়ায় বাঁ হাত দিয়ে মালিশ করছেন। দড়কচ্চা মেরে গেছে হাত।

এদিকে জেঠুমণির যা রাইফেল, তা বাঘ কি শম্বর কি ভাল্লুক মারার। ঐ রাইফেল দিয়ে খরগোশ মারলে প্রথমত খরগোশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, দ্বিতীয়ত রাইফেলের অসম্মান করা হবে। কিন্তু

খরগোশটারও ধৃষ্টতার সীমা থাকা উচিত।

পিছনে বসে আমি এবং দাশকাকু সবিস্ময়ে এবং সভয়ে দেখলাম যে, জেঠুমণি রাইফেল কাঁধে ওঠালেন।

মাহমুদ হোসেন মৃদু আপত্তি করতে গেল। বলল, ছোড়িয়ে হুজৌর। ইসকা আজ মওত্ নেহি হ্যায়।

অর্থাৎ ছেড়ে দিন হুজুর, এর আজকে মৃত্যু নেই।

পিছন থেকে জেঠুমণির অনুগত অনুচর যুগল বলল, আজ ইসকো খতম্ করেগা।

জেঠুমণি বললেন, মওত্ নেই? ফওত্ করেগা?

এমন সময় হতভাগা গুলিখোর খরগোশটা নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হঠাৎ রাস্তার ডানদিকে চলে গিয়ে একেবারে জীপের সামনেই একটা শাল গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়তে গেল।

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, খরগোশরা এরকম করেই লুকোয়। তুই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিস, জঙ্গলে, বিশেষ করে রাতে, ওদের গায়ে আলো পড়লে ওরা এইভাবে গা-ঢাকা দিতে চায়।

মুখটা গাছের আড়ালে লুকিয়েই ও ভাবল বুঝি খুব লুকিয়েছে। সমস্ত শরীরটা যে বাইরে আছে, সে-হুঁশ নেই। হুঁশ থাকলে মরতে যাবে কেন?

জেঠুমণি সেরিমনিয়াস্‌লি রাইফেলের ব্যারেলটা একেবারে খরগোশের গায়েই প্রায় ঠেকিয়ে গদ্দাম্ করে দেগে দিলেন।

আমার মনে হল প্রলয়কাল সমুপস্থিত। ধুলোর মেঘে ধরণী অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার হবার ঠিক আগে দেখলাম, খরগোশটা লাফিয়ে উঠেই চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। তখনও জর্দার নেশা ছিল আমার। কী দেখতে কি দেখলাম জানি না।

এতক্ষণে দাশকাকু কথা বললেন।

বললেন, আরে, এ তো একেবারে ছেদ্‌ড়ে-ভেদ্‌ড়ে গেছে, এ নিয়ে গিয়ে কী করবে? কাবাব পর্যন্ত হবে না।

জেঠুমণি বিজয়োল্লাসে আরো চারটে পান খেয়ে বললেন, আজকের পয়লা শিকার। একে তো স্টাফ্‌ করে রাখব আমার স্টাডিতে। যে কাণ্ড এ করল, যতগুলি গুলি খরচ করাল; তাতে তো এই খরগোশ লেজেণ্ডারি হয়ে গেছে।

যুগল বলল, এ মাহমুদ ভাইয়া, জল্‌দি উঠা লে উসকো—সামনেমে টাইগারকা চান্স্‌ হ্যায়।

দাশকাকু বেশ শান্তমনে খরগোশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, টাইগার? মানে বাঘ?

যুগল বলল, জী হুজৌর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

দাশকাকু জেঠুমণিকে সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, গাড়ি ঘুরাও।

জেঠুমণি বললেন, ছাড়্‌ তো ওদের কথা। বাঘ বললেই বাঘ? অত সহজে বাঘ দেখা গেলে তো হতই।

দাশকাকু বললেন, সহজে না হোক, কঠিনেও দরকার নেই। চারদিক খোলা, হুড-নামানো, উইণ্ড-স্ক্রীন-নামানো জীপে বসে এ কী ছেলেখেলা?

জেঠুমণি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আরে দাঁড়া, উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? খরগোশটাকে তুলে নিক।

মাহমুদ হোসেন জীপটাকে স্টার্টে রেখেই জীপের বাঁদিকের স্টীয়ারিং ছেড়ে নেমে জীপের সামনেটা ঘুরে গিয়ে খরগোশটাকে তুলবে বলে যেই তার পায়ে হাত দিল, অমনি খরগোশটা ওর হাতে আঁচড়ে দিয়ে তড়াক করে এক লাফে জঙ্গলে উধাও।

জেঠুমণির মুখের পান আর গলায় নামল না।

যুগল মিটিমিটি হাসতে লাগল, জেঠুমণির উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাহমুদ হোসেনও হেসে উঠল। তারপর আমি, শেষে দাশকাকু এবং জেঠুমণিও।

কতক্ষণ পরে আমাদের হাসি থামল তা আজ আর মনে নেই।

খরগোশটার গায়ে গুলি লাগেনি। কিন্তু অত কাছে অত হেভি রাইফেলের গুলি পড়ায় সে ভয়ে আর আওয়াজে অজ্ঞান হয়ে গেছিল।

মাহমুদ হোসেন স্টীয়ারিংয়ে ফিরে এসে আবার অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, একটু যেতে না-যেতেই যুগলের স্পটলাইটের আলোয় ডানদিকে জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে শ'খানেক গজ দূরে খাড়া পাহাড়ের গায়ে কিসের যেন নীলচে-লাল দুটো চোখ জ্বলে উঠল।

যুগল কী জানোয়ার তা নিরীক্ষণ করে বলবার আগেই জেঠুমণি গুলি চালিয়ে দিলেন। চোখটা জ্বলতেই লাগল। আবার গুলি চলল। আণ্ডার লিভারের ঘ্যাটা-ঘং আওয়াজ হচ্ছিল প্রত্যেকবার রিলোডিং-এর সময়।

দাশকাকু বললেন, ওরে, বাঘ যে ঘাড়ে চলে আসবে, স্টপ ইট্, স্টপ দিস চাইল্ডিশ ফায়ারওয়ার্ক। বাড়ি চল, প্লীজ বাড়ি চল।

জেঠুমণির ম্যাগাজিন যখন শেষ হয়ে গেল তখন গুলি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

যুগল হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

রণক্ষেত্র শান্ত হলে অবাক গলায় সে জেঠুমণিকে শুধোলো, কওন্ চি থা সাহাব?

জেঠুমণি চটে উঠে বললেন, ম্যায় কা জানতা? তুম বাত্তি ফেকা থা। ম্যায় উসি লিয়ে গোলি চালায়া।

যুগল বলল, ও তো মাইকা। অভ্র। চারদিকে অভ্রখনি। এখানে সব নানারকম পাথরের ভাঁজে ভাঁজে মাইকা থাকে। মাইকা জ্বলে ওঠে, আলো পড়লেই।

জেঠুমণি বললেন, ই-শ-শ, এতগুলো গুলি!

দাশকাকু বললেন, তাই-ই ভাবছিলাম। বাঘ হলে কি আর অ্যাটাক করত না এতক্ষণে?

মাহমুদ বলল, এক এক গোলিকা কিম্মৎ কিত্না সাহাব?

জেঠুমণি বললেন, দশ টাকা।

তাড়াতাড়ি হিসাব কষে মাহমুদ হোসেন বলল, ইয়া আল্লা, কিত্না আচ্ছা খাস্সি মিল যাতা থা একঠো, ইতনা রূপেয়াসে।

মাহমুদ হোসেন জীপ এগোতেই দাশকাকু বললেন, কি রে? আরও যাবি নাকি? শিকার তো হলই। আর কেন?

জেঠুমণি বললেন, সবে তো সন্ধে। এর মধ্যে ফিরে গিয়ে কী করবি বাংলোতে?

মিনিট পনেরো জীপ চলল, মাঝে মাঝে নাইট-জার পাখিগুলো লাল লাল গোল চোখ আর বাদামী-ছাই শরীর নিয়ে একেবারে জীপের বনেট ফুঁড়ে ফুঁড়ে উড়ছিল!

ঋজুদা গল্প থামিয়ে আমাকে বলল, পাখিগুলো তুই তো দেখেইছিস নিশ্চয়ই। জঙ্গলের পথের মধ্যে ঘাপ্টি মেরে বসে থাকে—জীপটা যখন প্রায় তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে ওমনি হঠাৎ সোজা মাটি থেকে ফর ফর করে উড়ে ওঠে।

দাশকাকু বললেন, এ কী অলক্ষুণে পাখি রে বাবা।

অলক্ষুণে কেন? জেঠুমণি বাঁদুরে টুপি-পরা মাথা ঘুরিয়ে দাশ-কাকুকে শুধোলেন।

ঠিক এমন সময়—হিস্‌স্‌-স্‌-স্‌-স্‌ করে যুগলের শিস্‌ শোনা গেল। আমরা সকলে একসঙ্গে আলোর দিকে তাকালাম। এইখানে রাস্তাটার দু পাশে উঁচু পাথুরে জমি প্রায় দু-মানুষ সমান। বাঁ দিকে সেই জমির ঠিক উপরে একজোড়া লাল চোখ জ্বলছে। দুটি চোখের মধ্যের দূরত্ব সামান্যই। কিন্তু লাল।

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, রিয়্যাল বাঘ।

আর যায় কোথায়?

জেঠুমণি রাইফেল তুলেছিলেন, দাশকাকু নিজের বন্দুকটা আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে অতর্কিতে পেছনের সীট থেকে জেঠুমণির উপর বডি-থ্রো মারলেন এবং বডি-থ্রো মেরেই দুহাতে রাইফেল-সমেত জেঠুমণিকে জাপটে ধরলেন। একে মোটা-সোটা জেঠুমণি মোটা ওভারকোট ও বাঁদুরে টুপিতে এমনিই আড়ষ্ট হয়ে ছিলেন, তার উপর এমন চোরা আক্রমণ।

যুগল নিবিষ্ট মনে ঐ চোখের দিকে চেয়ে ছিল। ড্রাইভারও। তারা দুজনেই জীপের মধ্যের ঐ হঠাৎ অনির্ধারিত আলোড়নে কোনো জানোয়ার পেছন থেকে উঠে পড়ল ভেবে চমকে উঠল।

জেঠুমণি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে নিশ্ছিদ্র আবৃত শরীরের উপরে দাশকাকুর শরীর, মুখ ভর্তি পান জরদা—কী বললেন শোনা গেল না—শুধু একটা ওঁ ওঁ ওঁ আওয়াজ শোনা গেল।

দাশকাকু ক্রমান্বয়ে বলে চলেছিলেন, সবে বিয়ে করেছি, এক বছরের ছেলে, বৌকে আমার বিধবা করিস না, ওরে—রিয়্যাল বাঘ! রিয়্যাল বাঘ!

জেঠুমণি রিয়্যাল বাঘকে গুলি করবেন না এমন ভরসা যখন ওঁ আঁ ইত্যাদি সাংকেতিক প্রক্রিয়ায় দাশকাকু পেলেন ওঁর কাছ থেকে, তখন উনি জেঠুমণিকে ছেড়ে দিলেন।

জেঠুমণি ছাড়া পেয়ে, পানের ঢোক গিলে যুগলকে শুধোলেন, কওন চি? যুগল!

যুগল নৈর্ব্যক্তিক অথচ বিদ্রূপাত্মক গলায় বলল, আঁখ খোল কর্ দেখিয়ে না। আভভিতক্ তো খাড়াই হ্যায়।

দাশকাকু চোখ বন্ধ করে বললেন. গাড়ি ঘুমাও ড্রাইভার।

এমন সময় সেই রিয়্যাল বাঘ উপর থেকে আমাদের উপরেই প্রায় জাম্প মারল।

দাশকাকু দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন।

বন-বিড়ালটা ধুলো আর পাথরে ভরা অসমান রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার এই ভীরু-ভরা জীপগাড়ির দিকে তাকিয়েই দৌড়ে ডানদিকের জঙ্গলে চলে গেল।

দাশকাকু ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ে, কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন, ওয়েল, ইট কুড্ এ্যাজ ওয়েল বী আ রিয়্যাল টাইগার। ইট কুড্ ইজিলি বী!

২

গদাধর চা এনে দিল, সঙ্গে পাঁপড় ভাজা। ঠিক সেই সময় ছোট-বালির গভীর থেকে রিয়্যাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার ডেকে উঠল হা-হুম্ করে। সুন্দরবনে নদী-নালা-ভরা বর্ষণসিক্ত গা-ছম্‌ছম্ জঙ্গলের মধ্যে যে বাঘের ডাক শোনেনি, জীবনে একটা পরম অভিজ্ঞতা থেকে তাকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে।

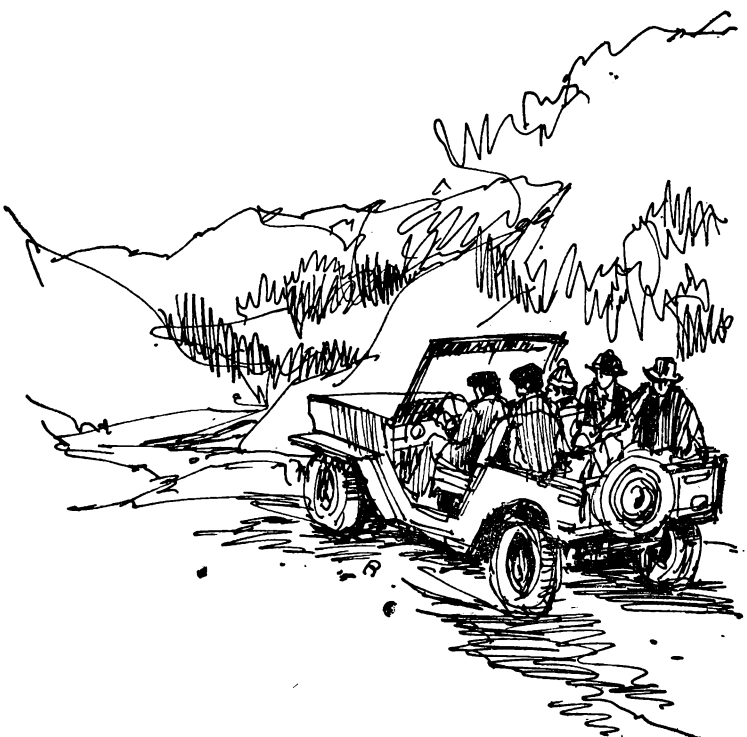

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পীরা বলেন, নাভি থেকে যে স্বর ওঠে তা হল নাদ। ব্যাঘ্র-নিনাদ যে কী পরম শরীর-মন ভরে দেওয়া আনন্দ, ভয় ও বিস্ময়ে পরিপ্লুত করা শব্দ, তা লিখে বলার নয়।

বাইরে সন্ধে হয়ে আসছিল। বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ারও বিরাম নেই। আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। বাঘের ডাক আমাদের উদাস, বিষণ্ণ এবং আমাদের চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল।

গদাধর এসে একটা লণ্ঠন দিয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, এখানে না। চোখে লাগে। সামনের ডেকে রাখ।

গদাধর বলল, বাবু, মামা যে বড় ডাকাডাকি করে। আজ একটু রাতে নাম্‌লি হত না? মামাকি যদি পাওয়া যায়?

ঋজুদা বলল, দুর্যোগ না কমলে নামা ঠিক হবে না গদাধর। এইরকম আবহাওয়ায় মাংসাশী জানোয়ারদের খুব সুবিধে। অন্য জানোয়ারদের সজাগ কান এই হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দে কাজে লাগে না—আর এই-ই সুবিধে হিংস্র জানোয়ারের। জঙ্গলে তো আর খালি চোখ দিয়ে কোনো কাজ হয় না—কান সেখানে মস্ত বড় জিনিস। কানে কিছু শুনতে না পেলে রাতের অন্ধকারে এই আবহাওয়ায় জঙ্গলে নেমে খামোখা বাঘের মুখের খাবার হয়ে লাভ নেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বাঘের সঙ্গে মোলাকাত্ হবে, ভয় নেই তোর গদাধর। তোর বাবার খুনের বদলা নেব। আমি এখানে খিচুড়ি খেয়ে মজা করতে আসিনি।

গদাধর মুখ নিচু করে বলল, সেই কথাই বাবু।

আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছই তার পরদিন সকালে খালপারে

নীলমণি একটা ঝাম্‌টি দেখিয়েছিল।

ঝাম্‌টি মানে, গাছের ডালের মাথায় একফালি ন্যাকড়া বেঁধে কাদাতে পুঁতে দেওয়া থাকে। সুন্দরবনের গভীরে প্রতি বছর এমন অনেক ঝাম্‌টি দেখা যায়। যেখানে বাঘে মানুষ নেয়, সেখানে ঝাম্‌টি পুঁতে বাউলে মউলে জেলেরা সাবধান করে দেয় অন্যদের। নিষেধ করে সেখানে নোঙর করতে।

কিন্তু যে যেখানেই নোঙর ফেলুক, সুন্দরবনে এসে বাঘের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলা মুশকিল। তবুও পোঁতে ওরা। সংস্কার; অভ্যেস।

গত বছর চৈত্র মাসে গদাধরের বাবা যখন মিঠে-পানি নেওয়ার জন্যে এই ছোটবালিতে নেমেছিল আরও চার-পাঁচজনের সঙ্গে, বাঘ তখন তাকে তুলে নেয়। মধু-পাড়া মউলেদের দলে ছিল গদাধরের বাবা।

গদাধর ঋজুদার কলকাতার খাস অনুচর। সুন্দরবনের গোসাবারও অনেক ভিতরে এক গ্রামে ওর বাড়ি। ঋজুদা বছরে ন' মাস প্রায় জঙ্গলে-জঙ্গলেই কাটায়—সারা বছর কলকাতায় ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট আগলায় গদাধর। বড় বিশ্বাসী আর ভাল লোক।

এবারে ঋজুদার সুন্দরবনে আসার উদ্দেশ্যই ছিল গদাধরের বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া। এখানে আসার আগে ঋজুদা আমাকে বলেছিল, বাঘ মারিনি বহু বছর। ইচ্ছে করে না অমন সুন্দর পুরুষালী জানোয়ারকে মারতে। কিন্তু গদাধরের ইচ্ছে। এটা একটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের ব্যাপার।

সারা বছর জঙ্গলেই থাকি। আজকে বহু বছর হয়ে গেল। আর আমারই যে আশ্রিত তার বাবাকে বাঘে নেবে এটা সহ্য করা

ঠিক নয়। গদাধরের কাছে ছোট হয়ে যাব ঐ বাঘটা মারতে না পারলে। মারতেই হবে। যে করেই হোক।

চা পাঁপড়-ভাজা খেতে খেতে আমি বললাম, বলো, তোমার গল্প থামালে কেন?

ঋজুদা বলল, পাঁপড় ভাজা মুখে নিয়ে কেউ গল্প বলতে পারে? দাঁড়া একটু।

হঠাৎ ঋজুদা বলল, এখান থেকে ফিরে গিয়ে কাজিরাঙ্গায় যাব একবার।

কেন? আমি সোৎসাহে জিগ্যেস করলাম।

ওখানে একটা গণ্ডার মেরেছে চোরা-শিকারীরা। চোরা-শিকারীরা আর্মড। বিরাট ডাকাতের দলের মতো অর্গানাইজেশন ওদের! অন্যান্য জানোয়ারও পোচিং করে। পুলিসের ডিটেকটিভ্‌রা জঙ্গলের এই সশস্ত্র শিকারীদের বাগে আনতে পারছে না। চোরা-শিকারী ধরা অন্য শিকারীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। ওখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একবার যেতে বলেছেন। অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট্। খুব অ্যাডভেঞ্চারাস্, কী বল? ডেঞ্জারাস্‌ও বটে! কারণ ওরা এর আগেও ফরেস্ট গার্ডদের মেরেছে—তাই আমাকে মারা তো খুবই সোজা। খুব থ্রিলিং হবে ব্যাপারটা। তাই-ই যাব ভাবছি।

আমিও যাব, বলে আমি নেচে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, পাগলামি করিস না। এ শিকারে যাওয়া নয়, শিকারী ধরতে যাওয়া। তুই কেন এর মধ্যে যাবি?

আমি বললাম, যদি আমাকে না নিয়ে যাও, তাহলে আমি কী করব দেখো।

ঋজুদা বলল, তুইও কি শেষে আমার মতো অশিক্ষিত হয়ে

থাকবি ? জংলি হয়ে যাবি ? তোর মা-বাবা কী বলবে আমাকে ?

আমি বললাম, তুমি অশিক্ষিত ?

অশিক্ষিত নই ? এম-এ বি-এ পাশ করাকে শিক্ষা বলে ? আসল শিক্ষা তো শুরু হয় বি-এ এম-এ পাশের পর। শুনিস্‌নি সেই কথা ? একজনকে জিগ্যেস করা হয়েছিল যে, ইউনিভার্সিটির পারপাস কি ?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, টু ব্রিং দ্য হর্স নিয়ার দ্য ওয়াটার অ্যাণ্ড টু মেক ইট থার্স্টি।

মানে বি-এ এম-এ পাশের পরই আসল জ্ঞানের শুরু। ইউনিভার্সিটি শুধু ছেলেমেয়েদের মনে জানার ইচ্ছেটুকুই জাগিয়ে দেয়। তার বেশি কিছু নয়। যদি কেউ মনে করে যে, ডিগ্রী পেলেই শিক্ষা শেষ হল তবে তার ডিগ্রী পাওয়াটাই বৃথা। যে যাই-ই পড়ুক, শেখার কি শেষ আছে ? মৃত্যুর দিন অবধি মানুষকে শিখতে হয়। সব মানুষকেই। যে যে-ভাবে শেখে। কেউ বই পড়ে, কেউ অন্যভাবে।

তারপরই বলল, তুই নিশ্চয়ই বোরড্ হয়ে যাচ্ছিস। ভাবছিস, এই সুন্দরবনে এসেও ঋজুদা জ্ঞান দিচ্ছে।

আমি বললাম, না। মোটেই না। আসলে কী জানো ? আমার এই বন-জঙ্গল পশু-পাখি, এই খোলা-আকাশের জীবন, তোমার সঙ্গে ঘোরা—এই সব ভাল লাগে বড়। তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি বন-জঙ্গলকে যে কী ভালবেসে ফেলেছি, তা কী বলব। আমার ইচ্ছে আছে আমি একোলজি নিয়ে পড়ব।

ঋজুদা বলল, খুব ভাল কথা। অনেক কিছু করার আছে ঐ বিষয়ে। তুই বন-জঙ্গল ভালবাসিস, একথা বুঝতে পারি বলেই অনেক বিপদের মধ্যেও তোকে আনি। অনেক ঝুঁকি নিয়ে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বিপদের মধ্যে যে আনন্দ

খুজে না পায়, কী শহরে কী জঙ্গলে ; যার জীবনে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, প্রতিবন্ধকতা নেই, প্রবলেম নেই, তার ধার বেশিদিন থাকে না। সে ভোঁতা হয়ে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই সব বুঝতেই তো জীবনের অর্ধেক চলে গেল আমার। তোরা তাড়াতাড়ি শুরু কর। জীবনে যে যত ছোটবেলায় ঠিক করে—কী সে করতে চায় জীবনে, তার জীবনের গন্তব্য কী—সে তত বড় হয়। এই পৃথিবীতে সময়ের চেয়ে দামী আর কিছুই নেই।

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, এখন ভাবি। জীবনটা সত্যিই একটা ম্যাটার অফ প্রায়োরিটিজ। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, কোন্ জিনিসটার কত দাম তোর কাছে, এইটে ঠিক করে নিয়ে মন-প্রাণ দিয়ে সেই জিনিসটার জন্যে লেগে পড়্—নিশ্চয়ই তা পাবি। তোরা কত ছোট। কত কী করার আছে তোদের জীবনে। তোরা জীবনে মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠ্—শুধু শরীরে মানুষ নয়—সত্যিকারের মানুষ। এইটে দেখে গেলেই তো বড়দের আনন্দ।

এই অবধি বলেই, আবার ঋজুদা বলল, দেখ্‌লি তো তোকে আবার কেমন জ্ঞান দিলাম। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আসলে। মানুষ যত বুড়ো হয় তত বেশি জ্ঞান দেওয়ার টেনডেন্‌সি হয়, জানিস্।

আমি বললাম, মোটেই তুমি বুড়ো নও। আর আমার এসব কথা শুনতে খুব ভাল লাগে। আমি আমার বন্ধুদেরও বলব। তোমার মতো সকলের যদি একটা করে দাদা থাকত।

ঋজুদা হাসল। বলল, তাহলে দেশসুদ্ধ ছেলে তোর মতো বকে যেত ; জংলি হয়ে যেত।

আমি বললাম, অনেকক্ষণ অন্য সীরিয়াস কথা হয়েছে। এবার আবার গল্প বলো।

ঋজুদা চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে শালটাকে জড়িয়ে নিল গায়ে ভাল করে। হু-হু করে ভেজা-হাওয়া বইছে। সুন্দরবনে এমনিতে শীতকালে বেশি শীত মোটেই থাকে না, কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টির জন্যে দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে।

ঋজুদা বলল, জেঠুমণি তখন খুব ভাল শিকারী। প্রথম শিকার-জীবনের গল্প সব নিজেই হাসতে-হাসতে বলেন সকলকে। এটা যে জেঠুমণির কত বড় গুণ ছিল, কী বলব। ক'টা লোক নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে পারে? নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে হৃদয়ের উদারতা লাগে।

যাই-ই হোক, জেঠুমণি তো শেষ বয়সে প্র্যাকটিস প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। অনেক ব্যবসার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন ধীরে-ধীরে। চা-বাগান নিয়েছিলেন একটা ডুয়ার্সে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বাংলোটা দারুণ ছিল। একবার শীতে গিয়েছিলাম ক'দিন। জেঠুমণির কাছে থেকে আসতে। সেবারই এই ঘটনাটা ঘটে।

একদিন জেঠুমণি আমাকে বললেন, শুয়োর মেরে তাড়াতাড়ি ফিরিস ঋজু—একজন নতুন বাঙালি প্ল্যাণ্টার এসেছেন এখানে। তিনি খেতে আসবেন।

আসলে ঐ বাগানটা বহুবার হাত-বদল হল। এখন যিনি কিনেছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ নেই আমার। ছোট্ট বাগান। তার বুড়ো ম্যানেজারের সঙ্গে বহুদিনের জানাশোনা। তিনি ফোন করে অনেকদিন হল বলছেন যে, আমার নতুন মালিককে নিয়ে আপনার কাছে আসব—উনি আলাপ করতে ব্যগ্র। তাই আজকে

খেতে বলেছি তাঁকে। ভদ্রলোক কলকাতার লোক। বোধহয় বাগান সম্বন্ধে জানতে-টানতে আসছেন। তোর কথাও বলেছি তাঁকে। তাড়াতাড়ি ফিরিস।

সেদিন বাংলোয় ফিরেই দেখি একটি রোলস-রয়েস্ গাড়ি দাঁড়িয়ে। উর্দিপরা ড্রাইভার ও পেয়াদা গাড়িতে বসে আছে শীতের মধ্যে। আমি তাদের নামিয়ে এনে জেঠুমণির লোকদের চা-টা খাওয়াতে বললাম। দরোয়ানরা বাইরে আগুন করেছিল। ওদের বললাম ওখানে বসে গল্প-টল্প করতে, গাড়িতে ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাচ্ছিল বেচারারা না হলে।

বিরাট ড্রইং-রুম জেঠুমণির। ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট। দেওয়ালে ও চারপাশে মাউন্ট করা বাঘ, ভাল্লুক, বাইসনের সব ট্রফি। তার মধ্যেই কোঁচানো ধুতি, দশহাজারি শাল এবং হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি নিয়ে এক ডিস্‌পেপ্‌টিক ভদ্রলোক বসে আছেন দেখলাম।

উনি যে বিরাট বড়লোক তা ওঁর সাজপোশাকে, কথায়-বার্তায় ফুটে বেরোচ্ছে। তাঁর সামনে জেঠুমণি একটা লুঙ্গি পরে তার উপর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে একটা আধ-ছেঁড়া শেয়াল-রঙা আলোয়ান গায়ে দিয়ে বসে আছেন।

পোশাক-আশাক সম্বন্ধে জেঠুমণির চিরদিনই একটা প্রচণ্ড নিস্পৃহতা ছিল। বলতেন, পুরুষ মানুষের পরিচয় তার গুণে—পোশাক দিয়ে কী হবে?

সাজানো-গোছানো ড্রইং-রুম, এসবই তাঁর বাগানের আগের মালিকের। শুধু ট্রফিগুলোই তাঁর। উনি বাংলোটা ফাঁকা পেলে বোধহয় তক্তপোশ, তাকিয়া, গড়গড়া, জর্দা আর পান দিয়ে ভরে রাখতেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে জেঠুমণি বললেন, এই যে রে, ঋজু, ইনিই মিস্টার ব্যানার্জি —কুকুর-খাওয়া বাগানের মালিক।

তারপরই বললেন, বুঝলি ঋজু, মিস্টার ব্যানার্জি খুব ধরেছেন যে, ওঁকে একটা বাঘ মারিয়ে দিতেই হবে। তুই যখন আছিস্, তুই-ই একটু চেষ্টা করে দে। আমি তো আজকাল বেরোইই না বিশেষ।

আমি বললাম, নো প্রবলেম্। কত মাকাল ফলে ডুয়ার্সের বাঘ মেরে গেল ; আপনি তো মারবেনই।

মিস্টার ব্যানার্জির সোনা-বাঁধানো-দাঁত ঝক্‌মক্ করে উঠল। রুপো-বাঁধানো-লাঠি নেড়ে বললেন, কবে ? কখন ?

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, বাঘ তো বাঁধা নেই। আমি থাকতে-থাকতে সুযোগ-সুবিধা হলেই হয়ে যাবে।

না, না। সুযোগ সুবিধা কী বলছেন—এ ভার আপনাকে নিতেই হবে মিস্টার বোস।

আমি বললাম, জেঠুমণি যখন আমাকে বলছেন, আপনার আর কিছু বলার দরকার নেই।

তা হলেও, তা হলেও; কালই আমি আমার রোলস্-রয়েস্ পাঠাব—আপনি আমার বাগানে একবার পায়ের ধুলো দিন।

আমার রাগ হল। আমি বললাম, আমি জীপ নিয়ে চলে যাব। আপনার গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই কোনো।

তাহলে আমার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া।

আমি বললাম, ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাব—আপনার ওখানে চা খাব এক কাপ। খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

তারপরই ভদ্রলোক বললেন, আপনি কী করেন ?

আমি বললাম, ভ্যাগাবণ্ড্ই বলতে পারেন। কিছুই করি না। একটু লেখালিখি করি।

ওঃ বুঝেছি। ভদ্রলোক বললেন।

জেঠুমণি বুঝলেন, আমি চটেছি।

তাড়াতাড়ি বললেন, শুয়োর পেলি? তোর সঙ্গে সিলভারস্টোন গেছিল, না একাই গেলি?

বললাম, সিলভারস্টোন গেছিল, চাওলাও গেছিল, বাগরাকোটের ডনাল্ড ম্যাকেঞ্জিও এসেছিল। সবসুদ্ধ ছ'টা শুয়োর পেয়েছি জেঠুমণি। সবই ডনাল্ড্কে দিয়ে দিয়েছি—কাল ওর বাড়িতে বার-বী-কিউ হবে। তোমাকে যেতে বলেছে বিশেষ করে। ফোনও করবে কাল তোমাকে।

জেঠুমণি বললেন, যাব নিশ্চয়ই। তবে তোর জেঠিমাকে শুয়োর-ফুয়োরের কথা বলিস্ না। পুজো-আর্চা করে। আমি তো ব্যাধ—ও বেচারির মনে দুঃখু দিয়ে লাভ কী?

আমি উঠে এলাম চান করতে, মিস্টার ব্যানার্জিকে বলে; বললাম, খাওয়ার সময় দেখা হবে।

বলেই, ঋজুদা অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে গেল। আমি বললাম, আবার কোন রাজ্যে চলে গেলে তুমি? বলো। থামলে কেন?

ঋজুদা বলল, সরী!

পরদিন সকালে গেলাম জীপ নিয়ে জেঠুমণির বাগানের একজনকে সঙ্গে করে। কুকুর-খাওয়া বাগানের পথ জানা ছিল না।

বাগানটা ছোট্ট, ছিমছাম। একারেজ বেশি না হলেও ভাল করে দেখাশুনা করলে ভালই চলার কথা। চায়ের কোয়ালিটি নাকি খুব ভাল।

মিস্টার ব্যানার্জি খুব যত্নআত্তি করলেন। দেখলাম, তাঁর বাংলোর বারান্দায় ইংল্যাণ্ডের রাজা-রানীর সব ছবি। তাঁর বাবা-ঠাকুর্দারা রায়বাহাদুর রায়সাহেব। তাঁদের দেওয়া ভোজের আসরে বাংলার সাহেব লাট সস্ত্রীক। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও এমন মনোবৃত্তি অবাক করল আমাকে। এই সব দেখে, এখনও এখানে যে গুটিকতক অশিক্ষিত ও আধা-অশিক্ষিত সাহেব ম্যানেজার-ট্যানেজার আছে তারা মিস্টার ব্যানার্জিকে কী-ভাবেন তা মনে করে লজ্জা হল।

যাই হোক্, আমি বললাম, চায়ের বাগানের মধ্যেই দু তিনটি জায়গায় কুকুর এবং ঘোড়া বেঁধে রাখতে। চিতাবাঘ তো জানিসই, পোষা কুকুর খেতে খুব ভালবাসে। আর বড়-বাঘের তন্দুরি-চিকেন হচ্ছে ঘোড়া।

বলে এলাম যে, রোজই বিকেল চারটেতে ওগুলো বেঁধে দিতে—সকালে খুলে নিতে। যদি কোথাও কিল্ হয়, তাহলে আমাকে ফোনে জানাতে।

মিস্টার ব্যানার্জি আমি আসার সময় আমার হাতে একটা খাম দিলেন। বললেন, এতে পাঁচশো টাকা আছে। আপনি কেন আমার জন্যে মিছিমিছি সময় নষ্ট করে আমাকে বাঘ মারাবেন?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি খুব বড়লোক হতে পারেন, কিন্তু ভদ্র-লোকদের সঙ্গে মেলামেশা বোধহয় বিশেষ করেননি। আপনি আমার জেঠুমণির পড়শি বলে আর কিছু বলছি না আপনাকে। এটা রাখুন।

বলেই চলে এলাম।

কথাটা জেঠুমণিকে বলিনি। বললে, তুলকালাম কাণ্ড হত।

কারণ জেঠুমণির বয়স হয়েছে। এই নির্জন জায়গায় প্রতিবেশী একে অন্যের উপকারে আসে অনেক।

তার পরের দিন ফোন এল সকালে যে, চিতাবাঘে কুকুর মেরেছে। গেলাম তক্ষুনি। কুকুরটার পেছন থেকে একটু খেয়েছে এবং তুলে নিয়ে গিয়ে একটা নালার মধ্যে রেখেছে। নালার কাছে বড় গাছ ছিল না মাচা বাঁধার মতো। তবে একটা কেসিয়া গাছ ছিল—তিন মানুষ সমান উঁচু হবে। তাতেই মাচা বাঁধলাম। দু'জন লোক বসতে পারে এরকম মাচা।

বাঘের পায়ের দাগ দেখে বুঝলাম, চিতাই। তাছাড়া বড় বাঘ সচরাচর কুকুর নেয় না। তবে জমিটা শক্ত থাকায় ও চায়ে ঢাকা থাকায় পায়ের দাগ ঠিকমতো দেখা গেল না।

যাই-ই হোক, আমি বললাম যে, বিকেল চারটের মধ্যে আমি আসব। উনি যেন তৈরি হয়ে থাকেন।

তারপর বললাম, আপনি আগে কি কখনও শিকার করেছেন?

ভদ্রলোক আমাকে শিকারের অ্যালবাম দেখালেন। হৈ হৈ ব্যাপার। সাহেব, মেমসাহেব, বেয়ারা, বাবুর্চি। গান্-র‍্যাকে সারি-সারি বন্দুক রাইফেল, যাকে বলে রাজা-রাজড়ার ব্যাপার।

আমি অ্যালবাম দেখতে-দেখতে আবার বললাম, আপনি কী কী শিকার করেছেন?

মিস্টার ব্যানার্জি ভুরু বেঁকিয়ে আমাকে উল্টে বললেন, এসব দেখার পরেও প্রশ্ন আছে আপনার?

আমি বললাম, তবে আমার সাহায্যের প্রয়োজন কী?

উনি বললেন, বাঘ ছাড়া সবই মেরেছি। তাই রিস্ক্ নিতে চাই না। তাছাড়া এ অঞ্চলে কখনও শিকার করিনি। এখানকার বাঘেদের

চরিত্র বা ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আমি বললাম, বাঘেরা তো মানুষের মতো ডুন-স্কুল কি আজমীর কি গোয়ালিয়রের পাবলিক স্কুলে অথবা কালীধন বা তীর্থপতি ইন্‌স্টিট্যুশানে পড়তে যায় না। তাদের চরিত্র এবং ব্যবহারের তারতম্য বিশেষ হয় না। যাই-ই হোক, তৈরি থাকবেন। আমি আসব।

বিকেলে গিয়ে দেখি এলাহি ব্যাপার। দু'জন গান-বেয়ারার দাঁড়িয়ে উর্দি পরে। একজনের হাতে পয়েন্ট থ্রি সেভেনটিফাইভ্ হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ডের ডাবল-ব্যারেল রাইফেল। আর একজনের হাতে চার্চিল ডাবল ব্যারেল শটগান—টুয়েলভ্ বোর। দুটোই কাস্টম-বীল্ট।

আমি শুধোলাম, কাস্টম-বীল্ট মানে?

ঋজুদা বলল, কাস্টম-বীল্ট মানে হচ্ছে হাতের কনুইয়ের মাপ, হাতের দৈর্ঘ্যের মাপ, আঙুলের মাপ সব নিয়ে কারো জন্যে বিশেষ করে যে-রাইফেল বা বন্দুক তৈরি হয়। আগেকার দিনে রাজা মহারাজারা কেউই স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েপন ব্যবহার করতেন না। সবই কাস্টম-বীল্ট।

ব্যানার্জি সাহেবই বা রাজা মহারাজাদের চেয়ে কম কিসে?

আমি বললাম, বলো, তারপর।

ঋজুদা আবার শুরু করল। আরেকজন বেয়ারার জিম্মায় একটা বেতের বাস্কেট, তার মধ্যে নানারকম খাবার-দাবার, জলের এবং অন্যান্য জিনিসের বোতল। অন্য একজন বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে একটা শাটিনের ওয়াড়-পরানো লেপ নিয়ে।

আমি তো দেখে থ! বললাম, এ কী ব্যাপার?

কেন ? সঙ্গে যাবে। বরাবর শিকারে সঙ্গে যায়।

আমি বললাম, মাচাতে তো আমার আর আপনার দুজনের বসার জায়গাই হবে না। এত কিছু ?

উনি বললেন, সারা রাত থাকতে হতে পারে তো ?

আমি বললাম, তা হতে পারে, যদি বাঘকে ঘায়েল করেন। অত কাছ থেকে গুলি করলে বাঘের ঐখানেই পড়ে থাকার কথা। দুটো ওয়েপনের দরকার নেই। তারপর বললাম, এর মধ্যে কোনটা আপনার হাতের ? মানে কোনটাতে আপনি ভাল মারেন ?

উনি বললেন, হার্বিভোরাস্, মানে তৃণভোজী জানোয়ার মারি শট্‌গানে, আর কার্নিভোরাস্, অর্থাৎ মাংসভোজী মারি রাইফেলে।

অনেক শিকারী দেখেছি জীবনে, এমন শুনিনি কখনও বুঝলি রুদ্র!

আবারও বললাম, আপনার গুলি কোন্‌টাতে বেশি লাগে—মানে মিস্ কম হয় ?

উনি বললেন, জীবনে মিস্ হয়নি। মিস্ হবে কেন ?

আমি হতাশ হলাম।

নিজের বা জেঠুমণির কোনো বন্দুক রাইফেল সঙ্গে আনলে ভাল করতাম। ব্যাপারটা যে এমন দাঁড়াবে ভাবিনি। ভেবেছিলাম, মাচায় বসে টর্চ দেখাব ঠিক করে, চিতা আসবে, ব্যানার্জী সাহেব গুলি করবেন। খেলা শেষ।

যাই-ই হোক, এখন যা হবার তা হয়ে গেছে। এ লোকের হাতে দুটি অস্ত্র দেওয়া আরো সাংঘাতিক। আমাকেই না মেরে বসেন।

তাই বললাম, একটা ওয়েপন নিন, আর বেয়ার নেসেসিটিজ্ যা।

ঠিক আছে।

বলে, মাচায় ওঠার আগে উনি শট্‌গানটাকে নিলেন। আর জলের বোতল।

আমি টর্চ নিলাম পাঁচ ব্যাটারির। আগে উনি উঠলেন মাচায়। তারপর আমি। লেপ-টেপ ফেরত পাঠালাম।

ওঁর লোকদের বললাম যে, গুলির শব্দ শুনেই যেন কাছে না আসে। যদি পর পর তিনটে গুলির শব্দ হয়, তাহলে হ্যাজাক নিয়ে, জীপ নিয়ে লোকজন নিয়ে যেন আসে। পায়ে হেঁটে কেউই আসবে না।

তখনও দিনের আলো দিব্যি ছিল। আদিগন্ত সবুজ ছোপ-ছোপ চায়ের ঝোপ। মাঝে-মাঝে হাত-ছড়ানো সুন্দর সব শেড-ট্রী। চায়ের গালিচা গড়িয়ে-গড়িয়ে মিশেছে দূরের নগাধিরাজ হিমালয়ের পায়ে। মাঝে তিস্তা তার শীতের গৈরিক পোশাকে টান-টান।

বড় ভাল লাগে এই তিস্তাকে আমার। ব্রহ্মপুত্র আর তিস্তার মতো সুন্দর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্রলোক খুব কমই দেখেছি। জানিস ত! এরা দুজনেই পুরুষ। এরা নদ, নদী নয়।

পশ্চিমের আকাশে সন্ধ্যাতারার নরম সবুজ চোখ জ্বলে উঠল জঙ্গলে, আলো-পড়া শম্বরের চোখের মতো। অন্ধকার হয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে শীতও এসে দু কাঁধ আর ঘাড়ের পেছনে তার দু'হাত জড়াবে। জার্কিনের কলারটা তুলে দিলাম। বুক পকেটে পাইপটা উল্টো করে রেখেছি। এখন আর পাইপ খাওয়ার উপায় নেই।

হঠাৎ প্ল্যান্টার ব্যানার্জি তাঁর চামড়ার বোতাম লাগানো মোহায়েরের কোটের পকেট থেকে কী একটা বড়ি বের করে ওয়াটার বট্‌ল থেকে জল ঢেলে খেয়ে ফেললেন।

খেয়েই আমার দিকে চেয়ে বললেন, আরেকটা খাই?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কী ?

কোরামিন। সীরিয়াস গলায় বললেন ব্যানার্জি সাহেব।

আমি কাঁদব, না হাসব, ভেবে পেলাম না।

কিছু বলার আগেই উনি বললেন, আমার নার্ভ যথেষ্ট স্ট্রং নয়। কঠিন কঠিন অ্যাডভেঞ্চারাস্ কাজ করার আগে আমি কোরামিন খাই। বিয়ে করতে যাবার দিনও একটা খেয়েছিলাম।

আমি চুপ করেই থাকলাম। বললাম, কথা বলবেন না। মাচায় বসে কথা বলা একেবারেই বারণ।

তখন তিনি সোনার সিগারেট কেস বের করে রনসনের গ্যাস লাইটার থেকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করতেই আমি বললাম, একদম না।

ভদ্রলোক আমার হৃদয়হীনতায় ব্যথিত হলেন।

ওঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি বললাম, দেখছেন না আমিও পাইপ খাচ্ছি না।

উনি বললেন, অ।

তারপরেই বললেন, বাঘের কোন্ জায়গায় গুলি করব ?

বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, এসব আগে জিগ্যেস করেননি কেন ?

তারপর বললাম, মুখোমুখি গুলি করলে বুকে অথবা দু' চোখের মাঝ-বরাবর করবেন। তবে মুখোমুখি গুলি না করারই চেষ্টা করবেন। বাঘ মাথা নিচু করে থাকলে ঘাড়ে গুলি করতে পারেন। সবচেয়ে ভাল সাইডওয়াইজ্, বাঘের পা যেখানে বুকের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে অ্যাংগুলার শট্ নেওয়া। মাচা থেকে মারলে শট অ্যাংগুলারই হবে। সমান লেভেলে থাকলে বুকে মারতে পারেন। কিন্তু পেটে বা বুকের পিছনে কোনো জায়গায় একদমই নয়।

কেন নয় ? ব্যানার্জি সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, পরে বলব। এখন একেবারে কথা বলবেন না। নড়াচড়া করবেন না। একদম চুপচাপ থাকুন।

অনেকক্ষণ সময় গেল। সন্ধেও হয়ে গেল। দূরের কুলি লাইন থেকে সাঁওতালদের মাদলের আওয়াজ আর গানের সুর ভেসে আসতে লাগল। আলো থাকতে চিতা এলে ভাল হত। কিন্তু সে-ব্যাটা তো তার নিজের ইচ্ছামতোই আসবে। আমাদের ইচ্ছেতে তো আর আসবে না।

হঠাৎ ব্যানার্জি সাহেব বললেন, সিটিং পজিশানটা চেঞ্জ করে পদ্মাসনে বসব ?

কী আর বলব !

বললাম, পদ্মাসনে বসে বাঘকে গুলি করতে অসুবিধে হবে।

আই সী। বললেন উনি।

আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন। আমি আমার নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ইশারা করলাম কথা না বলতে।

অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু শুক্লপক্ষ বলে চাঁদও উঠে গেছে। চারপাশ আস্তে আস্তে নরম দুধ্‌লি আলোয় ভরে উঠছে। হঠাৎ দূরের কুলি-বস্তি থেকে কুকুরগুলো সব একসঙ্গে ভুক্ ভুক্ করে ডেকে উঠল।

'ব্যানার্জি সাহেব, আমাকে আপত্তি জানানোর সুযোগ না দিয়েই, কোটের আরেক পকেট থেকে বিলিতি ওডিকোলন বের করে নিজের গায়ে ঢাললেন, এবং অর্ধভুক্ত কুকুটার গায়ে উপর থেকে ঝাঁকি মেরে ছুঁড়ে দিলেন। প্রথমে ওডিকোলন, পরে শিশিটাই।

বললেন, বড় বিচ্ছিরি গন্ধ।

আমি এবার রেগে গেলাম। বললাম, চলুন নেমে যাই। ওডিকোলনের গন্ধেই তো বাঘ আসবে না। বুঝতে পারবে না সে? বাঘ মারতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হয়।

ব্যানার্জি সাহেব তাতে বললেন, সরি, সরি! আর করব না। বাঘটা মারিয়ে দিন আমাকে প্লীজ।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ আমার মনে হল দূরে বাঁদিকে চায়ের ঝোপের মাঝে-মাঝে সাদা-মতো কী একটা জানোয়ার আসছে। চায়ের ঝোপ দুলে উঠছে। মৃদু খসখস্ শব্দ হচ্ছে তার গায়ের সঙ্গে চায়ের ঝোপের ঘষা লাগায়।

আমি উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব হয়ে বোঝার চেষ্টা করছি জানোয়ারটা কী। চিতা নিশ্চয়ই নয়। তবে কি হায়েনা? বেশ উঁচু জানোয়ার।

এমন সময় ব্যানার্জি সাহেব হঠাৎ আমাকে বললেন, একস-কিউজ মী। মে আই টক্ ইন ইংলিশ?

ওঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় লটর্ পটর করতে-করতে এক বিরাট রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার চায়ের ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে সোজা কুকুরটার কাছে এল এবং কুকুরটাকে খেতে শুরু করল নালায় নেমে।

এমনটি সচরাচর হতে দেখিনি। লেপার্ডের কিলে বড় বাঘ এমনভাবে এসে খায় না।

কিন্তু জঙ্গলে-জঙ্গলে ছোটবেলা থেকে ঘুরে এইটেই শুধু শিখে-ছিলাম যে, জঙ্গলে অসম্ভাব্য বলে কোনো কিছু নেই। যাঁরা জানোয়ারদের বিষয়ে সব কিছু জেনে ফেলেছেন, আমি সেই বোদ্ধাদের দলে পড়ি না। বারবারই দেখেছি, যেটাকে নিয়ম বলে

মনে-মনে মেনে নিতে আরম্ভ করেছি, পরক্ষণেই তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এইজন্যেই বড় শিকারীরা চিরদিন বলে এসেছেন, বী অলওয়েজ প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য আনএকস্‌পেকটেড্‌।

বাঘটা থাবা গেড়ে বসে কুকুরটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। অভুক্ত ছিল বোধহয়। এত মনোযোগ দিয়ে সে খাচ্ছিল যে, আমাদের উপস্থিতি, ওডিকোলনের গন্ধ কিছুই গ্রাহ্য করল না।

আমি বাঁ হাত দিয়ে ব্যানার্জি সাহেবকে আকর্ষণ করে ইশারায় বললাম যে, এবার মারতে হবে।

উনি বন্দুকটা তুললেন, কিন্তু তুলতে যেন বড্ড বেশি সময় নিলেন বলে মনে হল। বন্দুকের নলটা বাঘের দিকে হতেই আমি টর্চ ফেললাম বাঘের গায়ে, বন্দুকের ব্যারেলের উপর দিয়ে; যাতে নিশানা নিতে অসুবিধা না হয়।

বাঘটা বসা অবস্থাতেই মুখ তুলে আলোর দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ করল না। ডুয়ার্সের বাঘগুলোও বোধহয় স্কটিশ প্ল্যান্টারদের মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ হয়। এরকম আশা করিনি।

ব্যানার্জি সাহেব বন্দুক ধরেই রইলেন, গুলি আর করেন না। টিক্‌টিক্‌ করে সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড কেটে যাচ্ছে।

আমি ওঁর পেছনে আলতো করে বাঁ হাত দিয়ে চিমটি কাটলাম। চিমটি কাটার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের নলটা সজোরে উপরে-নীচে আন্দোলিত হতে লাগল এবং নল দিয়ে গুলি না বেরিয়ে ব্যানার্জি সাহেবের মুখ দিয়ে কথা বেরোল: ন্যাজে যদি নেগে যায়?

কী বলছেন বুঝতে না পেরে উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করতেই ব্যানার্জি সাহেব দম-দেওয়া পুতুলের মতো ক্রমান্বয়ে বলতে লাগলেন, যদি ন্যাজে নেগে যায়···যদি ন্যাজে নেগে যায়···যদি ন্যাজে···?

বলতে বলতেই আমার আতঙ্কিত চোখের সামনে ধ্বপ্ করে বন্দুকটা নীচে পড়ে গেল ওঁর হাত থেকে। আর সঙ্গে-সঙ্গে উনিও গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে আমার কোলে।

আমি তখন বাঘকে দেখি, না ওঁকে দেখি? উনি অজ্ঞান অবস্থায় কী যেন বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না।

বন্দুক পড়ে যাওয়ায় বাঘটা সরে গেছিল একলাফে। কিন্তু অবস্থা বুঝে গিয়েই ফিরে এসে কুকুরটাকে মুখে করে চায়ের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি বললাম, তারপর কী হল?

ঋজুদা বলল, শোন্ না।

কিন্তু কিছু না বলে কান-খাড়া করে কী যেন শুনল ঋজুদা বাইরে। তারপরেই সারেঙকে ডেকে বলল, আবহাওয়াটা যেন ভাল ঠেকছে না নীলমণি।

নীলমণি সারেঙ বলল, সেই কথাই বলব বলব ভাবছিলাম বাবু। মহা দুর্যোগ আসছে। এমন হলে বোট এখানে রাখা ঠিক হবে না।

৩

ঋজুদা বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দূরের অন্ধকার সমুদ্রের দিকে কী যেন দেখল, তারপর বলল, এঞ্জিন স্টার্ট করো। চলো ভিতরে গিয়ে আরো ভাল জায়গা দেখে নোঙর করি।

তাই-ই ভাল। নীলমণি বলল। তারপর এঞ্জিনম্যান নটবরকে বলল, স্টার্ট কর্।

ডিজেলের এঞ্জিন গুট্-গুট্-গুট্ করে স্টার্ট হল। নীলমণি ঘণ্টা দিল

ব্যাক করার।

মোটরবোট সুন্দরবনে চালাতে খুব মজা। যে সারেঙ, সে স্টীয়ারিং ধরে বসে থাকে। কোথায় চড়া, কোথায় জল, জোয়ার-ভাঁটা, গোন-বেগোন, খাল-সুঁতিখাল, বাওড়, নদী সব তার মুখস্থ। কিন্তু এঞ্জিনটা থাকে নীচে। উপর থেকে সে দড়িতে বাঁধা ঘণ্টা বাজিয়ে এঞ্জিনম্যানকে সিগন্যাল দিলে এঞ্জিনম্যান সেইমতো গীয়ার চেঞ্জ করে, ব্যাক-গীয়ার দেয়; এঞ্জিন বন্ধ করে। একে অন্যকে দেখতে পর্যন্ত পায় না।

ঋজুদা আর আমি বাইরের ডেকে এসে দাঁড়ালাম। নীলমণি বোটটা একটু ব্যাক করে নিতেই বড় খালে এসে পড়ল বোটটা। বড় খালে আসতেই বুঝলাম সমুদ্রে কী বিপর্যয় চলছে। বড়-বড় ঢেউ আর উথাল-পাথাল ঝড়ের শব্দে সুন্দরবনের নদী, গাছপালা পাগলের মতো মাথা, হাত-পা ঝাঁকাঝাঁকি করছে।

নীলমণি বলল, সামাল। সামাল।

আমরা ডেকে বসে পড়লাম। বোটটা পাশ হতেই ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। কোনোক্রমে সামলে নিয়ে গুট্-গুট্-গুট্ করে বোট চলতে লাগল। সার্চলাইটের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ইলিশমাছের আঁশের মতো চক্‌চক্ করে উঠছিল।

আমরা নীলমণির ঘরে চলে গেলাম আবার। বেশ খানিকটা ভিতরে গিয়ে একটা ছোট খালে ঢুকতে বলল ঋজুদা। সেই খালের দুপাশে বিরাট বিরাট কেওড়াগাছ। আর কী কী গাছ আছে, অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল না। কেওড়াগাছের ডালগুলোয় শোঁ শোঁ করে হাওয়া আর্তনাদ করছিল এসে।

সুন্দরবন এমনিতেই কেমন আন্‌ক্যানি লাগে আমার কাছে। ঋজুদাও সে-কথা বলে। ভারতবর্ষের আর-কোনো জঙ্গলের সঙ্গে

এই আশ্চর্য অরণ্যের তুলনা হয় না। সুন্দরবনের গভীরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত যে না কাটিয়েছে, সে এ-কথার তাৎপর্য বুঝবে না।

খালটাতে ঢুকেই নীলমণি আতঙ্কিত গলায় বলল, এখানে?

ঋজুদা বলল, এখানে ঝড়ের দাপট কম হবে নীলমণি।

নীলমণি গররাজি গলায় বলল, তা হবে। কিন্তু জায়গা বড় সাংঘাতিক বাবু। এ-তল্লাটে এমন সর্বনেশে খাল আর দুটি নেই।

ওর কথা শেষ হবার আগেই সার্চলাইটের আলোয় খালের দুপাশে সার-সার প্রায় দশটি ঝামটি দেখা গেল। হঠাৎ খালের মাঝখানে জ্বলন্ত কাঠকয়লার মতো মাথা-ভাসানো একটা বিরাট কুমিরের চোখ জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই কুমিরটা মাথা ডুবিয়ে নিল।

ঋজুদা বলল, থাক ঝামটি। তোমরা কেউ বাইরে বা জালি-বোটে শুয়ো না। মোটরবোটে উঠে বাঘ কখনও নেয়নি কাউকে সুন্দরবন থেকে।

নীলমণি বলল, তা নেয়নি কিন্তু কোনোদিন নিতেও তো পারে?

ঋজুদা বলল, এই দুর্যোগের হাত থেকে তো আগে বাঁচতে হবে। বোটসুদ্ধ ডুবে গেলে তো কুমিরে আর হাঙরে সকলকে ছিঁড়ে খাবে। আর বাঘের জন্যে তোদের ভয় নেই। আমি আজ সারেঙের ঘরে রাইফেল নিয়ে পাহারা দেব। তোরা সকলে নিশ্চিন্তে নীচে ঘুমো। ঠাণ্ডা আছে, তাছাড়া বৃষ্টিও হচ্ছে। সব পর্দা-টর্দা বন্ধ করে শুয়ে থাকিস। কোনো ভয় নেই। আরাম করে ঘুমো, ভাল করে খেয়ে দেয়ে।

নীলমণি অগত্যা আরও ভিতরে নিয়ে গিয়ে বোট থামাল। নটবর আর পরেশকে বলল, ভাল করে নোঙর ফেল্, রাতে না নোঙর

হেঁটে যায়।

ততক্ষণে খিচুড়ি হয়ে গেছে। বেশ শীত করছে। আমরা নীচে কেবিনে নেমে গরম-গরম খেয়ে নিলাম। তারপর পয়েন্ট ফোর-ফিফটি ফোর-হাণ্ড্রেড ডাবল্ ব্যারেল রাইফেলটাতে গুলি ভরে ঋজুদা উপরে উঠল। আমাকে বলল, তুই নীচেই শো।

আমি বললাম, কেন? তোমার সঙ্গে যাই।

ঋজুদা বলল, দুজনে অল্প জায়গায় কষ্ট করে শুয়ে লাভ নেই। তোর বন্দুক, গুলি আর টর্চ হাতের কাছে রাখিস। পর্দা ভাল করে ফেলে নিস।

তারপর আমাকে ফিসফিস করে বলল, ওদের বললাম বলে কী, আমিও তো ঘুমোব। তবে আমার ঘুম সজাগ। বাঘ যদি বোটে ওঠার চেষ্টা করে তাহলে টের পাওয়ার কথা। তবে এ পর্যন্ত কখনও বোটে ওঠেনি আজ অবধি। দিশি নৌকো থেকে মানুষ নিয়েছে বহু। তবু মোটর বোটে যে উঠবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আরামে জমিয়ে ঘুমো। দুর্যোগ কমলে গদাধরের বাবার মৃত্যুর বদলা নিতে হবে। অনেক অ্যাডভেঞ্চার তোর জন্যে বাকি আছে এখনও। এখন ঘুমিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে।

কম্বল গায়ে দিয়ে আরামে শুয়ে পড়লাম। খিচুড়িটা দারুণ রেঁধেছিল গদাধর। কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করে ওরাও সকলে শুয়ে পড়ল। বোটের সামনে ও পিছনে দুটি লণ্ঠন ফিতে কমিয়ে রেখে দিল ওরা। ঋজুদা ওদের সকলকে বলে দিল, আমাকে না বলে কেউ যেন রাতে ডেকে আসিস না। দরকার হলে আমাকে চেঁচিয়ে ডেকে তারপর আসবি।

বাইরে শোঁ-শোঁ করে হাওয়া বইছে। এখন জোয়ার। জোয়ারে

ভেসে-আসা কাঠকুটো লতাপাতা কত কী জলের সঙ্গে বোটের খোলে সড়সড় করে শব্দ করে ঘষে যাচ্ছে। কেওড়া, সাদা বাণী, হেঁতাল, গরান, গোলপাতা, গেঁও আর সুঁদ্‌রীর পাতায়-পাতায় ঝোড়ো হাওয়ার কত না দীর্ঘশ্বাস। জিন-পরীরা বুঝি এমনই দিনে খেলতে নামে বনে-বনে।

বড় বড় ডালপালা সম্বলিত কেওড়া গাছেদের নীচে-নীচে অনেকখানি জমি ফাঁকা দেখা যায়। যে মাঠে চিতল হরিণের দল খেলে বেড়ায়। কেওড়া ফল বড় ভালবাসে ওরা। কত-কত বুড়ো হরিণ! কী তাদের শিং-এর বাহার। গায়ের রঙ পেকে সোনালি থেকে কালো হয়ে গেছে।

আজ এই দারুণ দুর্যোগের রাতে হরিণ, বাঁদর কি কোনো রাতচরা পাখিও ডাকছে না। শুধু জলের শব্দ, ঝড়ের শব্দ, সমুদ্রের শব্দ। বড়-বড় কেউটে সাপগুলো এখন কী করছে কে জানে? কুমিররাও কি আজ তাদের নদীর পারের জলের তলার গভীর গর্তে আঁট-সাঁট হয়ে শুয়ে আছে? হাঙরেরা এই দুর্যোগে কী মাছ পায়? কোনো ফিশ-ক্যাটও খাল-পাড়ে বসে মাছ ধরার চেষ্টা করছে না আজ। আজ যে বড় দুর্যোগ।

আর বড় বাঘ? মামা? বাঘ তো বেড়ালের মাসি। ওদের গায়ে জল লাগলে বাঘ বড় খুশি হয়। অন্যান্য জঙ্গলে দেখেছি, জঙ্গলে বৃষ্টির পর বাঘ এবং অন্যান্য অনেক জানোয়ার ফরেস্ট রোডে এসে বসে থাকে অথবা হেঁটে যায়। কারণ বৃষ্টি-শেষে লতাপাতা থেকে অনেকক্ষণ অবধি বড় বড় ফোঁটা টাপুর টুপুর করে পড়ে। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘের কথা আলাদা। জলই তাদের ঘরবাড়ি। নোনা জল।

রাত দিনের মধ্যে চার বার জোয়ার ভাঁটার খেলা চলে এখানে। ভাঁটায় গাছ-গাছালির ভাসমান এরিয়াল রুটসগুলো সব বেরিয়ে পড়ে দাঁত বের করে। ভাঁটার সময় সমস্ত জঙ্গলকে নানা-রঙা শিকড়ের-দাঁত-বার-করা এক ধাঁধার মতো মনে হয়। কত বিচিত্র প্যাটার্ন, আঁকি-বুঁকি, কারুকাজ সে-সব শিকড়ের। আবার যেই জোয়ার আসে, দু-মানুষ তিন-মানুষের বেশি জল বাড়ে। তখন পুরো জঙ্গলকে মনে হয় একটা ভাসমান বোটানিকাল গার্ডেন। সবুজ লাল পাটকিলে হলুদ পাতায় আর ফুলে ফুলে নদী-খালের দু পাড় ভরে যায়। জোরে জল ঢোকে তখন সুঁতিখালগুলোয়।

সুন্দরবনের গভীরে যে উঁচু জায়গা থাকে—তাকে বলে ট্যাঁক্। ট্যাঁক জোয়ারের সময়েও শুকনো থাকে। জোয়ারের সময় বাঘ এবং অন্যান্য জানোয়ারও ঐ ট্যাঁকেই থাকে জল এড়াতে। তারপরই ভাঁটার সময় কাদা ভেঙে ভেঙে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। ভাঁটা দিলেই সোজা গোল-গোল বিভিন্নাকৃতি শিকের মতো কেওড়া গাছের শিকড়গুলো মাথা বের করে মাঠময় উঁচিয়ে থাকে। ঐ শিকড়গুলোকে বলে শুলো। তার উপর পড়ে গেলে একেবারে শরশয্যা। কী যে ধার শুলোগুলোর মুখে, তা বলার নয়।

উভচর স্যালামাণ্ডার বুকে হেঁটে হেঁটে প্যাতপেতে গা-ঘিন্‌ঘিনে কাদার উপর দিয়ে পত্‌পত্‌ করে চলে। কত রকম জোঁক, পোকা, মাছি, মৌমাছি ; কত রঙের। কত মাছ, ছোট বড়।

চারদিকে এই সুন্দরবনে কী আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। পাখি এখানে অন্যান্য জঙ্গল থেকে অনেক কম। কিন্তু ডাকতে ডাকতে যখন কাদাখোঁচা, কার্লু বা মাছরাঙা উড়ে যায় তখন একটি পাখির গলার স্বরও এই জলজ প্রকৃতিতে যে কত দূরে জলের উপরে উপরে ভেসে

যায় তা কী বলব! এমন আশ্চর্য নিবিড় ভয়াবহ অতিপ্রাকৃত শান্তি পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আছে। আনন্দের মধ্যে, সৌন্দর্যের মধ্যে ঠাসবুনটে বোনা এমন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভয়ও আর কোথাও নেই।

শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম, এখন ঝাম্‌টির ফালি-ন্যাকড়াগুলো ঝড়ের দাপটে পত পত করে উড়ছে। আমাদের দেশের মানুষ যে কত গরিব, বেঁচে থাকার, দু-মুঠো খেতে পাওয়ার ও একটি ধুতি-গামছার জন্যে কত লোকের যে প্রাণ যায় প্রতি বছর আজকেও এই সুন্দরবনে, তা যারা জানে; তারাই জানে। ওদের গ্রাম থেকে ওরা যখন ফাগুন-চোতে বেরোয় প্রতি বছর, তখন কারা যে ফিরবে আর কারা যে বাঘ কিংবা কুমিরের পেটে যাবে তা কেউই বলতে পারে না।

নৌকো এসে লাগে বাদা থেকে সুন্দরবনের গভীরে। ডাঙায় নেমে প্রথমে পুজো দেয় পুরুত। ওরা বলে দেয়াসি। মন্ত্রজ্ঞ। পুজো দেয় বনবিবির। বাবা দক্ষিণ রায়েরও দেয়। আরও কত দেবদেবী। দক্ষিণ বাংলার কত শত লৌকিক দেবতা।

চৈত্রের প্রথমে সুন্দরবন ফুলে-ফুলে সেজে ওঠে। শীতে এলে সে-রূপ দেখা যায় না। তখন কেওড়া, ওড়া, গেঁয়ো, গরান সব গাছই ফুলে ফলে ভরে ওঠে। ফুলপটি তলার লাল নীল হলুদ-রঙা ফুল। মৌমাছির দল আর প্রজাপতির দল তখন আকণ্ঠ মধু পানে ব্যস্ত হয়ে চঞ্চল পাখনায় ঘুরে বেড়ায়।

মউলেরা কোঁচড়ে করে বন বিভাগ থেকে আছাড়ে পটকা নিয়ে ডাঙায় নামে। মন্ত্রজ্ঞ পুজো-পাঠ সেরে পায়রা বলি দিয়ে বলে, যা তোরা, ভয় নেই কোনো। গরান ফুলের থেকে মধু খেয়ে যেই মৌমাছি ওড়ে, অমনি সেই মৌমাছিকে অনুসরণ করে মউলে চলে বনে-বনে, মৌচাকে গিয়ে পৌঁছবে বলে। যে হ্যাঁতাল গেঁয়ো গোলপাতার

নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে রাইফেল হাতে ঢুকতেও ভয়ে বুক কাঁপে, সেই বনে চাক ভেঙে মধু পাড়বে বলে মউলে বনবিবির হাতে তার প্রাণ জমা দিয়ে ধুতি-লুঙ্গি কষে নিয়ে কাদা ভেঙে চলে। বাঘ কখন কোথা থেকে যে এসে পড়ে, তা বাঘই জানে। হৈ হৈ পড়ে যায়। আছাড়ে পট্‌কা ফাটে। নিরস্ত্র অসমসাহসী মানুষগুলো দৌড়ে যায় বাঘের মুখ থেকে আত্মীয় বন্ধুকে ছাড়িয়ে আনতে।

কিন্তু বড় বাঘ যাকে একবার ধরে, সচরাচর সে বাঁচে না। শেয়ালে যেমন কই মাছের মাথা চিবিয়ে ধান খেতের আলে ফেলে দিয়ে যায়, কখনও বাঘও তেমনি করে মানুষের মাথাও চিবিয়ে বাদায় ফেলে সরে যায় বিরক্ত হয়ে। যে মারা যায়, তার শবের অংশ কখনও পায় দাহ করার জন্যে ওরা, কখনও পায় না।

ঝাম্‌টি পড়ে নদী বা খালের সেখানে। তারপর আবার নতুন উৎসাহে অন্যরা মরণ-মাছিকে ধাওয়া করে মৌচাকের দিকে চলে। যে মধু তারা পাড়ে তাদের নিজের জীবনের মূল্যে, মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীরা তার দাম দেয় সামান্যই। সেই মধু বহু হাত ঘুরে আমাদের খাওয়ার টেবিলে আসে চড়া দামে। কিন্তু সেই সোনালি মধুর পিছনে যে করুণ অশ্রুসিক্ত কাহিনী থাকে, তার খবর আমরা রাখি না।

দুপুরবেলা একচোট ঘুমিয়েছিলাম বলে ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে বাইরের উন্মত্ত প্রকৃতির প্রলয় নৃত্যের আওয়াজ শুনতে পাই। দামাল হাওয়া বোটের ত্রিপলের পর্দার কোণগুলোয় পত-পত আওয়াজ তুলে বোটের গায়ে আছাড় মারে। আমি শুয়ে-শুয়ে অনেক কথা ভাবি, অন্ধকারে। কিছু শোনা, কিছু দেখা।

কতরকম যে কাঁকড়া সুন্দরবনে! কতরকম যে তাদের রঙ!

বড় বড় কাঁকড়াও আছে তাদের মধ্যে। কী মিষ্টি শাঁস। পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা দিয়ে রাঁধলে মাংসের চেয়েও উপাদেয়।

ব্যাঙও হরেক রকমের। কালো ব্যাঙ, রূপো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, হলুদ-রেখা ব্যাঙ, পাতাসি ব্যাঙ, সবুজ ব্যাঙ, ব্যাঙে-ব্যাঙে সুন্দরবন 'বাঙ্ময়'!

মাছের কথাও কী আর বলব! কাঁকলাস মাছ। ট্যাংরা, কুচো চিংড়ি, ভেট্‌কি, খয়রা, ভাঙর, কানমাগুর। মেনি মাছগুলো ভাঁটি দিলেই কাদার উপর চিড়িং বিড়িং করে লাফায়।

ভাঁটির সময় জল কমে গেলে বাঘ খালের মধ্যে মাছ ধরে। হাতের থাবা মেরে-মেরে এক-এক ঝট্‌কায় মাছকে শূন্যে তুলে পাড়ে ছুঁড়ে দেয়। তারপর অনেক মাছ হলে সেগুলোকে জড় করে খায়। শেষ হলে পর আবার খালে নেমে আসে।

কুচো চিংড়ি দিয়ে কেওড়া ফলের টক রাঁধে সুন্দরবনের লোকেরা। দারুণ খেতে। হেঁতালের মাথা কেটে বড়াও ভেজে খায় ওরা। খেতে বেশ। খয়রা মাছ ভাজা, ভেট্‌কির কাঁটা-চচ্চড়ি, ট্যাংরার ঝাল, বড় চিংড়ির মালাইকারি, কচ্ছপের মাংস।

মাছের বাহার বর্ষায়। রেখা, রুচো, দাঁত্‌নে, ভাঙন, কাল-ভোমরা, পান-খাওয়া, পারশে, তপসে, কুচো চিংড়ি এবং নানানিবিমুনি মাছ।

বর্ষার সুন্দরবনের রূপও নয়ন-ভোলানো। ভয়াবহ সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্ষার এই বনের এই রূপের সঙ্গে তুলনীয় বেশি কিছু নেই।

এখানে কত রকম যে গাছ—কেওড়া, হেঁতাল, গেঁয়ো, গরান, সুন্দরী ছাড়াও আছে পশুর, আমুড়, ধোঁদল, বাইনন্। আর অপ্রধান গাছের মধ্যে আছে গোলপাতা, লোহাগড়া, ভাতকাটি, শিঙড়ে,

টক-সুঁদরি। গেঁওর লতা লাল টুকটুক সিঁদুর-রঙা হয়ে ওঠে। তখন দেখতে যে কী ভাল লাগে। টক-সুঁদরি বন খুব ছোট-ছোট, নিবিড়। এর মধ্যে দিয়ে বাঘ হরিণকে ধাওয়া করে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিণের শিং যায় এতে আটকে। তখন বাঘ তাকে ধরে খায়। কত যে পশু পাখি জীব জন্তু। একে অন্যকে মেরে খায়। আমাদের চোখে তা বিসদৃশ লাগে বটে, কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য এমনি করেই বজায় থাকে। যিনি জীব সৃষ্টি করেন তিনিই তার খাওয়ার সংস্থানও করে দেন। মানুষ বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয়, কিন্তু কোনো এক বিশেষ কারণে সুন্দরবনের প্রায় সব বাঘই মানুষখেকো। এর কারণ বলতে গেলে আলাদা প্রবন্ধ লিখতে হয়। তার জায়গা এ নয়। তাছাড়া তার যোগ্যতাও হয়তো আমার নেই। ঋজুদা লিখলেও লিখতে পারে।

খয়েরি গোলফলের কাঁদিগুলো যখন নুয়ে পড়ে জলের উপর, দেখতে ভারী ভাল লাগে তখন। খেতেও মন্দ নয়। তালশাঁসের মতো মিষ্টি। কেমন একটা বুনো-বুনো গন্ধ তাতে।

গভীর রাতে এবং দিনেও নদীর ধারে জোয়ারি পাখিরা ডাকে পুত্ পুত্ পুত্। বাউলে মউলেরা বলে এর পিছনে প্রবাদ আছে। সেই ডাক শুনতে ভারী ভাল লাগে। এই বন এমন ভয়াবহভাবে নির্জন, নিস্তব্ধ যে, যে-কোনো শব্দকেই মধুর লাগে কানে।

একজন নাকি তার ছেলেকে নদীর খোলে ভাঁটার সময় শুইয়ে কী করছিল, জোয়ার এসে ছেলে ভাসিয়ে নেয়। পুত্রশোকে সে পাখি হয়ে যায়। পাখি হয়ে গিয়ে সেই থেকে সে নদীতীরে ডেকে ফেরে, ভাঁটায় রাখলাম পুত্, জোয়ারে নিয়ে গেল পুত ; পুত ; পুত ; পুত ; পুত···

এইসব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল নীলমণির উত্তেজিত চিৎকারে।

৪

আমার মনে হল তখনও রাত আছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম যে, দুর্যোগ ও পর্দা টানা ছিল বলে অন্ধকার মনে হচ্ছে কেবিনের ভিতরটা।

চিৎকার শুনে বুকটা ধক্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা হাতে নিয়ে ডেকে উঠে এলাম। এসে দেখি সকলেই তখন ডেকে দাঁড়িয়ে। ঋজুদা, নীলমণি, নটবর, পরেশ এবং গদাধরও।

কখন শেষ রাতে ভাঁটি দিয়েছে কে জানে। ঋজুদা, নীলমণি ও নটবরের খেয়াল করা উচিত ছিল যে, ঐ ছোট্টখালে আমরা যখন ঢুকি, তখন জোয়ারের সময় অনেক জল ছিল যদিও, কিন্তু ভাঁটিতে আমাদের বোট প্রায় কাদায় ঠেকে যাবে। দেখলাম, বোটের বাঁ দিকটা যাকে ইংরিজিতে বলে পোর্ট-সাইড্, একেবারে পারের সঙ্গে এবং নদীর পেলব কাদাময় বিছানার সঙ্গে সেঁটে গেছে।

অনেক কিছুই হতে পারত রাতে, যখন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। কিন্তু যা ঘটেছে তা দেখেই আমাদের সকলের চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। নরম কাদায় বাঘের অজস্র পায়ের চিহ্ন। বাঘটা কতবার যে বোটের একেবারে গায়ে-গায়ে কাদার উপর হেঁটেছে ভাঁটি দেওয়ার পর, তার ইয়ত্তা নেই। এপাশে গেছে ওপাশে গেছে—সমস্ত পারের নরম কাদায় বাঘের পায়ের দাগে-দাগে ছুঁচ ফেলার জায়গা নেই। বাঘটা যে ডাঙায় উঠে চলে গেছে, তার দাগও পরিষ্কার দেখা গেল। এবং আশ্চর্য! সেই দাগে তখনও জল চুঁইয়ে যাচ্ছে। মানে নীলমণির ঘুম ভাঙা অবধিও বাঘটা বোটের সঙ্গে প্রায় লেগেই ছিল বলতে গেলে।

ঋজুদার অনুমানই সত্যি হয়েছে। বহুদিনের সংস্কারবশে বাঘ মোটরবোটে ওঠার সাহস করতে পারেনি। যদি উঠে আসতে চাইত, তাহলে কাদাতে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সহজেই উঠে আসত পারত এবং যে-কোনো একজনকে তুলে নিয়ে যেতে পারত।

দেখলাম, গদাধর ও পরেশ বিস্ফারিত চোখে নীলমণি ও নটবরের সঙ্গে কথা বলছে। কী হতে পারত, সেটাই তাদের গবেষণার বিষয়।

ঋজুদা বলল, বৃষ্টিতে ভিজে তোরা কী করছিস? ভিতরে যা সকলে। চায়ের জল চাপা। বেলা অনেক হয়েছে। দুর্যোগ এখনও কাটেনি বলে বোঝা যাচ্ছে না।

আমি মুখ ধুতে ও রাতের জামা-কাপড় ছাড়তে কেবিনে এলাম। দেখি ঋজুদাও নেমে এসেছে। ঋজুদাকে খুব আপসেট্ দেখাচ্ছিল।

আমাকে বলল, খুব অন্যায় হয়ে গেছে কাল, বুঝলি রুদ্র? যদি ওদের কাউকে সত্যিই তুলে নিয়ে যেত, তাহলে কী করে মুখ দেখাতাম বল তো? আমি তো নিজে এত ঘুমিয়েছি যে, সাড় ছিল না। ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকেও স্বচ্ছন্দে তুলে নিতে পারত। অসুবিধা কিছুই ছিল না।

আমি বললাম, চলো না, এক্ষুনি নেমে বাঘটাকে স্টক করি—ফলো করি।

ঋজুদা হাসল। বলল, সুন্দরবনের বাঘকে তুই জানিস না এবং এখানকার টোপোগ্রাফিও জানিস না। এখানে অধৈর্য হওয়া মানেই মৃত্যু। বাঘের পিছু নেওয়ার সময় এখন নয়। সময় যখন হবে, তখন আমিই বলব। গদাধরকে যা বলেছি, তা করব।

অনেকদিন পর দেখলাম, ঋজুদার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল।

মাঝে মাঝে ঋজুদা হঠাৎ কেমন দূরে, অনেক দূরে চলে যায়। তখন মনে হয়, এ-মানুষটাকে চিনিই না যেন।

বেলা হল; কিন্তু রোদ উঠল না। কাল রাতের মতো অতটা দুর্যোগ নেই বটে, কিন্তু এখন টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে এবং ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

বোটের নোঙর তুলে নিয়ে আমরা বড় খালে এসে আবার নোঙর করলাম। বাউলে ও জেলেরা ছোটবালিতে জল-কেটে নিতে আসে, যদি তাদের সঙ্গে সবজি, নুন, দেশলাই, বিড়ি বিনিময় করে মাছ নেওয়া যায়। সুন্দরবনের জলে-বাদায় টাকার দাম নেই কানাকড়ি। টাকা এখানে কাগজ বৈ নয়। নুন লঙ্কা মশলার বদলে মাছ পাওয়া যায়,

অথবা সবজির বদলে কাঁকড়া। মিষ্টি জলের বদলে তো সবকিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু আমরা ছোটবালির কাছেই আছি, মিষ্টি জলের দাম এখানে তেমন নয়।

জল-কেটে নেওয়া মানে মাটির জালায় বা মেঠোতে পানীয় জল তুলে নেওয়া। বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে নিলে তির্‌তির্‌ করে মিষ্টি জল জমে সেখানে। যারা জল ছেঁচে তুলে নিয়ে যায়—তারা চলে গেলে সেই গর্তে আবার জল ভরে ওঠে ধীরে ধীরে। অনেকদিন কেউ জল না কাটলে ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যায় গর্তটা ঝরে-পড়া বালিতে।

আমরা যখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি তখন দূর থেকে ছপাছপ্‌ দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল আর মানুষের গলার স্বর। কে একজন গলা খাঁক্‌রে কাসল। সামনে খালটা বাঁক নিয়েছে বলে এখনও নৌকো দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে ডাকাতিও হয় মাঝে-মধ্যে। রাতের বেলা ছইয়ের নীচে মিট্‌মিটে লণ্ঠন ঝুলিয়ে কোনো নৌকো এসে বলে, একটু আগুন হবে? ছিলিম ধরাতাম।

অবশ্য মোটরবোটে বড় একটা হয়নি। নৌকো করে ডাকাতরা মোটরবোটে ডাকাতি করতে এলে তাদের জব্দ করবার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে দূর থেকে হেভি রাইফেল দিয়ে তাদের নৌকোর তলা ফাঁসিয়ে দেওয়া। যদি কুমির-হাঙরে না ধরে, তবে সাঁতরে গিয়ে তাদের ডাঙায় উঠতে হবে। এবং কুমির হাঙরের হাত থেকে বাঁচলেও বাঘের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনা কম, নৌকাডুবির পর।

অবশ্য আজকাল ডাকাতরা আর আগের মতো লাঠি-সড়কি কি পাইপগান কি গাদা-বন্দুক দিয়ে ডাকাতি করে না। তাদের কাছে লাইট মেশিনগান, হাতবোমা, স্টেনগান, ব্রেনগান সবকিছুই থাকে।

তাদের পক্ষে বোটে উঠে ডাকাতি করাটাও কিছুই নয়।

দুটো নৌকো বাঁকের মুখে দেখা গেল। দুটিই জেলেনৌকো। একটি বড়, একটি ছোট। ছোটটিতে ওরা বোধহয় রান্নাবান্না করে। হাঁড়ি-কুড়ি, মিষ্টি জলের জালা, উনুন এসব রয়েছে তাতে। দুজন লোক। আর বড় নৌকোটাতে জনা ছয়েক লোক। দুটিতেই ছই দেওয়া। জেলে-নৌকো ওগুলো। বড় নৌকোতে বসে একজন বুড়ো সাদা-দাড়িওয়ালা মাঝি হুঁকো খাচ্ছে। ছইয়ের উপর খেপ্‌লা জাল শুকোচ্ছে। সেই জাল গোছ করে টাঙানো আছে বাঁশের খোঁটাতে। গল্প-গুজব করতে করতে আসছে জেলেরা।

নৌকো দুটো কাছে আসতেই নীলমণি চেঁচিয়ে উঠল, মাছ হবে নাকি গো?

তেমন লাই বাবু। ভেটকি আছে খান দুই, আর কেঁকড়া। কেঁকড়া লাও ত' লাও। ভেটকিও দেতে পারি একখানা।

তাই-ই দাও। নীলমণি বলল। তারপর বলল, বদলে লেবে কী?

যা দেবে। তরকারি আছে নাকি কিছু? পনর দিন তরকারি খাইনি।

আছে আছে। নৌকো লাগাও দেখি।

অনেকদিন পর ওরা মানুষের মুখ দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল।

নীলমণি আর গদাধর মাছ ও কাঁকড়া নিয়ে ওদের তরি-তরকারি দিল বদলে। বিড়ি বিনিময় হল। ছোট নৌকোতে একটি পনর বছরের ছেলে ছিল। বুদ্ধিভরা মিষ্টি মুখ। কালো, মাজা চেহারা। রোদে পুড়ে গায়ের রঙ তামাটে। নোনা জলে চান করে করে চুলে পানকৌড়ির মতো জেল্লা লেগেছে।

ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে কৌতূহলী চোখে ঋজুদার মুখের পাইপটাকে লক্ষ করছিল।

হঠাৎ হেসে ফেলে জিগ্যেস করল, তোমার হুঁকাটা অত ছোট কেন গো বাবু? আমার বাবার কাছে বড় হুঁকা আছে, দু টান দাও দিখিন্ ওতে, ভিরমি লেগে যাবে।

ঋজুদা হাসল। বড় সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি বন-জঙ্গল-গ্রামের মানুষজনকে আপন করে নিতে পারে ঋজুদা।

বলল, আমি কি তুমার বাবার মতো তামাক খেতিছি লাকি? ইতে কী আছে তা জানো ছেলে?

কী? উদ্‌গ্রীব হয়ে ছেলেটি শুধোল।

ঋজুদা ঠাট্টা করে বলল, বিলাইতি তামাক আছে। এক টান মাইরলে তুমার বাবারও ভিরমি লেইগ্যে যাবে গো।

এমন সময় একটা বড় পাখি এসে বসল খালের পারে। এই দুর্যোগে বোধহয় বেচারা ডানা শুকোবার অবসর পায়নি। জলটা ধরেছে বলে বোধহয় একটু হাওয়া লাগাতে বেরিয়েছে।

গদাধর সোঁদরবনের লোক হলে কী হয়, সে এখন কলকাতাইয়া বাবু হয়ে গেছে।

গদাধর সেই ছেলেটিকে বলল, ঐটা কী পাকি গো ছেলে?

ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলল, মদনটাক্কি!

ঋজুদা বলল বুড়ো মাঝিকে, তোমার নামটা কী হে?

বুড়ো বলল, সাজাহান এজ্ঞে।

ঋজুদা বলল, দাড়িটা তো শাজাহানের মতোই রেখেছ, কী বলো?

ঐ হইয়ে গেছে আর কী। আমাদের আবার দাড়ি। গজাতি

গজাতি এক কাঁড়ি।

ঋজুদা আবার শুধোল, ছেলের নাম কী দেছ গো?

বুড়ো বলল, মীরজাফর।

ঋজুদা অবাক হয়ে বলল, শাজাহানের ছেলে মীরজাফর কেন?

বুড়ো বলল, শাজাহানের ছেলির নাম রাখলি তো বুড়ো বয়সে বাপকি ঐ অবস্তাতিই নেত। তার চেয়ে অন্য নামই ভাল।

কিন্তু মীরজাফর কেন?

বেইমান। বেইমান। সব বেইমান। জোয়ান হলি কি বুড়রে দেইখবে? দেইখবে না ছাই। তাই আমি আগে থাকতিই বুক বেঁধে রাইখছি—যাতে কষ্ট-টষ্ট বেশি না পেতি হয়।

ঋজুদা হাসল। বলল, ইটা বইলেছ ভাল।

তারপর বলল, মাছ ধরতেছিলে কোথায়? চামটায় লাকি?

চামটার নাম কোরোনি বাবু। বড় চামটা, ছোট চামটা, সবই বড় সব্বনেশে জায়গা। মামার রাজত্ব। আবার শুনতেচি নাকি মামা-সকলের বংশবিরিদ্ধির নিমিত্তি সোঁদরবনে বাঘ-পেকল্প কইরবেন উনারা। মজা মন্দ লয়। মামায় খেইয়ে খেইয়ে আমাদের বংশ-লাশ হবার উপক্রম, আর কর্তারা সব লাকি মামাদিগের বংশবিরিদ্ধির কাজে নেইগেচেন।

ঋজুদা বলল, মানুষ তো আর বাঘের আসল খাবার নয়। চোরা শিকারীরা এসে সব হরিণ, শুয়োর মেরে সাফ করে দিয়েছে বলেই তো বাঘ এখন মানুষ খায়। বাঘ-প্রকল্প হলে তোমাদের ক্ষতি কী?

শাজাহান চটে উঠে বলল, ই এট্টা কতার মতো কতা কইল্যে বটে তুমি। কবে মামায় মানুষ খেইত্যো না শুনি। আমি তো জন্ম থিকেই শুইনে আসতিচি, দেইখ্যে আসতিচি যে, মামায় মানুষ নিতেচে

পতিবছর। তোমরা শেষে সোঁদরবনের বাঘের মাস্টার হইয়েছ, আমরা গরিব-গুরবো মুক্কু-সুক্কু মানুষ হয়ে কী আর বলি? বলার লাই কিছুই।

ঋজুদা বুঝল, বুড়ো শাজাহান চটেছে। বলল, চা খাবে?

তা খেতি পারি।

ঋজুদা গদাধরকে বলল, গদাধর, ভাল করে তেজপাতা, লবঙ্গ, আদা-টাদা দিয়ে চা বানা ত বেশি করে ওদের সকলের জন্যে। আর হ্যাঁ, খাবার কিছু আছে?

গদাধর দেশের লোককে খাতির করার অর্ডার পেয়ে পুলকিত হয়ে বলল, ডিম আছে অনেক। তুমি যা এনেছ দাদাবাবু, তা তো পুরো পল্টনের খাবার। পাঁউরুটিও আছে। আমি ওদের ফ্রেঞ্চ-টোস্ট করে দিচ্ছি। ভাল করে পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে।

বেশি করে করিস। ঋজুদা বলল। তারপর বলল, শাজাহান, একটু চা-টা খেয়েই যাও। তাড়া কিসের? তোমরা যাচ্ছিলে কোথা?

আর কোতা? পানি-কাটতি। তারপর বলল, চা তো খাওয়াবেন বাবু, তার আগে এট্টু পানি যদি দেতেন।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। বলেই ঋজুদা হাঁক ছাড়লো, ওরে নটবর, পরেশ, ওদের সবাইকে জল খাওয়া আগে।

বুড়ো শাজাহান বলল, আমরা পানি-কেইটে ফেরার পথি তোমাদের পানি তোমাদের শোধ কইরে যাব!

ঋজুদা হাসল। বলল, আমাদের দু-দুটো ড্রামে জল আছে। তোমাদের জল ফেরত দিতে হবে না।

আমি ভাবলাম—কী ভাল এরা। কত সম্মানজ্ঞান। ভিক্ষে চায়

না কোনো কিছুই। দয়া চায় না কারো কাছে।

ঋজুদা বলল, নুন-টুন আছে তো শাজাহান? না, দেব বলো?

লবণ তো বড় সমস্যা লয় এখানি। পানি জ্বাল দিলিই তো লবণ —তবে বড় কষা-কষা লাগে। থাকলি দিতি পারো এট্টু! ব্যঞ্জনে সোয়াদ হত।

ঋজুদা পরেশকে বলল, এক প্যাকেট টেবল সল্ট এনে দে তো ওদের।

ঋজুদার ব্যবহারে লোকগুলো বেশ ঢিলে-ঢালা হয়ে বসেছিল। বিড়ি খাচ্ছিল, হুঁকো খাচ্ছিল। সাধারণত মোটরবোট দেখলেই বাউলে-মউলে-জেলেরা ভয় পায়। কতরকম বড় লোক আছে এদেশে। ওদের কাছ থেকে মাছ কেড়ে নিয়ে যায়, পয়সা না দিয়েই, বা নামমাত্র পয়সা দিয়ে। ওরা যখন নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি গামছায় ঘাম মুছতে মুছতে স্বগতোক্তি করে, বড় খেতি হইয়ে গেল, বড়ই খেতি হইয়ে··· তখন বাবুরা, ব্যাটাদের কেমন ঠকিয়েছে, এই নিয়ে জয়োল্লাস করেন। ঠকানোটা একটা উঁচুদরের আর্ট, খেলা ওঁদের কাছে।

শাজাহান খেদের সঙ্গে বলে, ইখানে খাদ্য-খাদকের বড়ই অভাব। বুইজলেন বাবু।

আমি ওর বাংলা শুনে হেসে ফেললুম। খাদ্য-খাদক বলতে ও খাবার-দাবার বোঝাচ্ছিল।

আমাকে হাসতে দেখে ও হাসির কারণ বুঝতে না পেরে বলল, কী গো খোকা। বিশ্বেস কইরলে না বুজি?

আমাকে খোকা বলাতে আমার ভীষণ রাগ হল।

ঋজুদা মজা পেয়ে বলল, আরে খোকার মতামত ধরতে গেলে

কি চলে ? ছেলেমানুষ। ও কী জানে ?

ভাল হবে না কিন্তু। আমি বললাম, ঋজুদাকে।

ঋজুদা বলল, কথা না বলে চুপ করে শোন শাজাহানের কথা। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। ওর কথা শুনলে তুই কত কী শিখতে পারবি। চুপ-চাপ থাক। তা না, নিজেই কথা বলছিস কেবল।

আমি চুপ করে গেলাম লজ্জা পেয়ে।

ঋজুদা বলল, কী শাজাহান ? তুমি চুপ করে গেলে কেন ? কিছু বলো।

বুড়ো লজ্জিত হল। সঙ্কুচিতও। বলল, কী যে বলেন বাবু। আমরা মুক্কু-সুক্কু লোক—এই বাদার মধ্যিই জনম-করম, আমরা হতিছি গিয়ে ডোবার ব্যাঙ। আপনাদের সামনি কি মুখ খুলতি পারি আমরা ?

আমি লজ্জিত হলাম। আশ্চর্যও হলাম। যারা সত্যিই অনেক জানে, অভিজ্ঞতা যাদের অশেষ, তারাই বোধহয় নির্বাক থাকে। কথা বলে না। কথা না বলতেই ভালবাসে। আর যাদের জ্ঞান কম, ওপর-ওপর, কোনো কিছুরই গভীরে যারা যায়নি, তারাই তাদের অনভিজ্ঞতার অল্প জলে কই মাছের মতো খল্‌বল্‌ করে—নিজেদের বিদ্যা জাহির করার জন্যে।

ঋজুদার অনেক পীড়াপীড়িতেও শাজাহান কিছু বলল না। শুধু বলল, বলার মতো কী আছে ? মাছ ধরতি আসি ফি বছর, কেউ ফিরি, কেউ ফিরি না। বড় কষ্ট গো আমাদের বাবু। বাঘ, কুমির, হাঙর, মহাজন, ফরেস্ট ডিপার্ট এই নে আমাদের ঘর। এই-ই সব।

ঋজুদা চুপ করে রইল। দেখলাম, খাল যেখানে গিয়ে দূরের

জঙ্গলে বাঁক নিয়েছে, সেদিকে চেয়ে রয়েছে ঋজুদা। শাজাহানও চুপ করে ছিল।

হঠাৎ আমার মনে হল, জল বাদার সাধারণ মানুষ বড় দুঃখী। এই মানুষটার সঙ্গে এই মুহূর্তে ঋজুদা কোথায় যেন মিশে গেছে। অন্যের দুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব করার ক্ষমতা ভগবান সকলকে দেন না। ঋজুদাকে দিয়েছেন। আশীর্বাদ!

জোয়ার আসছে। জোরে জল ঢুকছে খালে; সুঁতিখালে। জলের উপরে-উপরে নিচু দিয়ে উড়ে চলেছে একদল মেছো বক। ওদের ডানার ছন্দ যেন জলের ছন্দের সঙ্গে মিশে গেছে।

বাঁদর ডাকছিল পাশের জঙ্গল থেকে হুপ্-হাপ্। দুপ-দাপ্ ঝুড়-ঝাড় শব্দ করছিল ওরা ডালপালায়।

শাজাহান ঐ দূরাগত শব্দ শুনে বলল, এট্টু সাবধানি পানি কাটিস মীরজাফর তোরা। আমার মনটা কেন জানি হঠাৎ কু ডাকতিছে!

আবহাওয়াটার আস্তে আস্তে উন্নতি হচ্ছে। হাওয়ার বেগটাও যেন কম কম মনে হচ্ছে। আজ বিকেলের দিকে মেঘভার কেটে গিয়ে রোদ উঠলেও উঠতে পারে।

গদাধর, পরেশ, নটবর, সকলে মিলে ট্রেতে বসিয়ে গরম-গরম ফ্রেঞ্চ-টোস্ট, পাঁপড়-ভাজা আর চা নিয়ে এল ওদের সকলের জন্যে।

কাপে চা দেখে শাজাহানের পছন্দ হল না। বলল, গ্লাস নেই লাকি গো? আমারটা গ্লাসি করি দাও। এমন ভাল চা কি ঐ ছোট্ট কাপি খেইয়ে সুখ হয়?

মীরজাফর চায়ে চুমুক দিয়েই চোখ মুখ উজ্জ্বল করে বলল, কমমো

ফতে। তারপরই চেঁচিয়ে বলল, ও বাপজান, ই চায়ে কী যেন মিইশে দিছে।

ঋজুদা হো-হো করে হেসে ফেলল, ওর কথা শুনে।

শাজাহান নিজের গেলাসে এক চুমুক মেরে বলল, এরই কারণে মীরজাফর তুই মাদ্রাসায় যেতি পারলিনি। তেজপাতা আর আদার গন্ধ চিনতি পারলিনি?

মীরজাফর সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, তুমি না-হয় উসব গন্ধ-টন্ধর কথা বলতি পারো, আমি কবে তেজপাতা আর আদা দে চা খেলাম যে জাইনব?

শাজাহান খুশি হল। বলল, ইটা একটা কতার মতো কতা কইচিস বটে তুই। লে, ইবার বাক্যি বন্ধ কইর‍্যে খাদ্য-খাদক খেয়ে লে দিকিনি বাপ। তোর বাপজান তো তুরে এমন সব বিলাইতি খাদ্য-খাদক খাওয়াতি পারেনি কক্‌খনো। তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, কী বলো হে সাগরেদরা। ঠিক বইলতিচি কিনা।

ঠিক। ঠিক। একশোতে দুশো। ঠিকই বলতিচো গো শাজাহান চাচা। ওরা একসঙ্গে বলল।

একটু পর শাজাহান বলল, লে, তুরা ইবার গবাগব্‌ খা দিকিন। খেইয়ে-দেইয়ে তারপর যা তুরা, পানি কাটতি যা। আমি ই বাবুটার সঙ্গে এট্টু কতা কই। আবার দেখা হয় কি, লা হয়, কে জানে।

মীরজাফর আর শাজাহানের আরো তিনজন সঙ্গী খাওয়া-দাওয়া করে, চা ও জল খেয়ে ছোট নৌকোটা খুলে নিয়ে বে-গোনে দাঁড় টেনে ছপাছপ্‌ করে চলে গেল ছোটবালির দিকে।

ওরা যেখানে নৌকো নোঙর করে জল কাটবে, সে-জায়গাটা এখান থেকে বড় জোর আধমাইলটাক হবে। তবে ঘন জঙ্গল থাকায়

এবং নদীটা সামনে গিয়ে বাঁক নেওয়ায় এখান থেকে তা দেখা যায় না।

একটা লাল রঙের খোপখোপ লুঙ্গি মেলা ছিল নৌকোটার ছইয়ের উপরে। সেটা জঙ্গলের নরম ভিজে সবুজের মধ্যে বাঁকের মুখে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

শাজাহান তার হুঁকোতে ভাল করে তামাক সেজে হুঁকো খেতে খেতে গল্প করতে লাগল ঋজুদার সঙ্গে। বুড়োর সঙ্গে আরো যারা ছিল, তারা নিজের-নিজের কাজ করছিল। বাধ-জালের গোছাটা খুলে ছইয়ের উপর মেলে দিল দুজন। আর দুজন খেপ্‌লা-জালটা মেরামত করতে লাগল মনোযোগ দিয়ে, মাথা নিচু করে।

আকাশ আস্তে-আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে। জোরে জোয়ারের জল ঢুকছে নদী দিয়ে। আমাদের বোটটা জল বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে-আস্তে উঁচু হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর-পর খেয়াল করলে বোঝা যায়। ঝড়বৃষ্টিতে নানা-রঙা পাতা, খড় কুটো, মরা ডাল ঝরে পড়েছিল। সেগুলো সব ভেসে চলেছে। একটু পরেই জোয়ার সম্পূর্ণ হবে। ডানদিকে, ইংরিজিতে যাকে স্টারবোর্ড সাইড বলে, বোটের গায়ে ঘষে ঘষে সড়সড়, সিরসির আওয়াজ করে ভেসে যাচ্ছে সেগুলো। একটা হাঙর একবার মাঝনদীতে উল্টে উঠেই ডুবে গেল।

জোয়ারের স্রোতের সঙ্গে খালের মধ্যে ভাঙন মাছ ঢুকছে লাফালাফি করে। একটা সুঁতিখাল এসে মিশেছে সামনেই। সেই খালেও জলের সঙ্গে মাছ ঢুকছে। যখন ভাঁটা দেবে, মাছগুলো জলের সঙ্গে আবার নেমে আসবে। তখন কোনো ফিশক্যাট বা বাগরোল থাবা মেরে-মেরে মাছ ধরে খাবে। অনেক দূর থেকে নীল-হলুদ-লাল মেশানো বড় মাছরাঙা আশ্চর্য ধাতব ডাক ডাকতে-

ডাকতে উড়ে আসছে এদিকে। তার সেই ডাকে এই জলজ প্রভাতী নিস্তব্ধতা কাঁচের বাসনের ভেঙে পড়ার শব্দের মতো শব্দ করে চুরচুর করে ভেঙে যাচ্ছে।

যে-লোকগুলো মুখ নিচু করে খেপলা-জালটা মেরামত করছিল, তাদের মধ্যে একজন গুনগুন্ করে একটা গান গাইছিল।

ঋজুদা শুনতে পেয়ে বলল, এট্টু জোরে গাইলি তো আমরাও শুনতে পেতাম।

যে গাইছিল, সে ঐ কথায় চমকে উঠে লজ্জা পেল।

ঋজুদা আবার বলল, গাও না ভাই—শোনাও তো একটা গান।"

ওর সঙ্গী সাথীরাও পীড়াপীড়ি করল। তাতে লোকটি মুখ না তুলেই, তার জোড়া হাঁটুর উপর থুতনি রেখে গান ধরল। সুন্দর জারিনারে, তোমারে কইরব বিয়া···

তার গানের সুরে এমন এক উদাস, বিধুর রেশ ছিল যে, আমার মনে হল সুন্দরবনে না হলে ও গান মানাত না। সুন্দরবনের লোকের লেখা, সুন্দরবনের মানুষের গলায় এবং সুন্দরবনেই গাইবার জন্য ও গান।

গান থামলে, শাজাহান বলল, এ হল গিয়ে যাত্রার গান। কবিগানও হয় মাঝে-মাঝে। কবির-লড়াই।

এমন সময়ে হঠাৎ শাজাহান উৎকর্ণ হয়ে সোজা হয়ে বসল। ওর চোখ মুখ কপালের উপরে সার সার বলিরেখা কুঁচকে উঠল। পরক্ষণেই ও নৌকোর পাটাতনের উপর উঠে দাঁড়াল। কান খাড়া করে কী যেন শুনতে চেষ্টা করল।

ঋজুদাকেও দেখলাম, হঠাৎ উত্তেজিত। জোরে বলল, নটবর,

পরেশ, একদম চুপ কর। মশলা পরে বাটবি। কোনো শব্দ করিস না। বলেই, ঋজুদাও দাঁড়িয়ে উঠে কী যেন শোনার চেষ্টা করল।

দূর থেকে হৈ-হৈ আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা জলের উপর দিয়ে পিছলে আসছিল। দুমদাম করে আছাড়ি পটকা ফাটার শব্দ হল।

ঋজুদা সঙ্গে সঙ্গে নটবর ও পরেশকে সংক্ষিপ্ত অর্ডার দিল, নোঙর তোল। তারপরই বলল, নীলমণি বোট খোলো, শিগগির ছোটবালির দিকে বোট নিয়ে চলো।

৫

শাজাহান বুড়ো, হুঁকোটাকে ছইয়ের ভিতরের বাখারিতে ঝুলিয়ে রেখে হালে বসেছে, অন্যরা দাঁড়ে। বোটের সঙ্গে বেঁধে-রাখা দড়িটা খুলে ফেলে ঝপাঝপ্ করে দাঁড় বেয়ে ওরা বোট ছেড়ে ছোটবালির মুখের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

নোঙর তুলতে এঞ্জিন স্টার্ট করে বোট চালু করতে মিনিট তিন-

চার সময় লাগল। তারপর পুট পুট পুট করে বোটটা এগিয়ে চলল। একটু গিয়েই আমরা শাজাহানের নৌকোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

বাঁকটা ঘুরতেই দেখলাম, মীরজাফরদের নৌকোটা লগিতে বাঁধা দড়ির সঙ্গে ছোটবালির চরে লাগানো। ওরা নৌকোর পাশেই বালিতে লাফালাফি করছে। বালির মধ্যে একটা কালো জলের জালা পড়ে রয়েছে।

আমাদের আসতে দেখে ওরাও নৌকো খুলে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে—কিছু বলবে বলে। ওদের খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

ঋজুদা কেবিনে চলে গিয়েছিল বোট স্টার্ট হতেই। দেখি পায়জামা-পাঞ্জাবি ছেড়ে অন্য পোশাক পরে, রাইফেলটা হাতে নিয়ে ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে দু মিনিটের মধ্যে।

ওদের নৌকোটার কাছে আসতেই নীলমণি বোটের এঞ্জিন বন্ধ করে দিল। ভাসতে ভাসতে বোট ওদের নৌকোর কাছে পৌঁছে গেল।

লোকগুলো বলল, মামা! মামা! বাবু, মামা!

ততক্ষণে শাজাহানের নৌকোও এসে ভিড়ে গেছে পাশে।

ছোট নৌকোর লোকেরা বলল, ওরা যখন জল কাটছে সকলে মিলে কথা বলতে বলতে তখন···

এমন সময় হঠাৎ শাজাহান বুক-ফাটা চিৎকার করে উঠল, বাপজান! আমার বাপজান রে···

আমি তখনই প্রথম লক্ষ করলাম যে, ছোট নৌকোয় যারা গিয়েছিল তাদের সকলেই আছে, শুধু মীরজাফর নেই।

শাজাহান নিজের বুকে নিজে ঘুষি মেরে, দাড়ি টেনে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল পাগলের মতো। খেপ্‌লা জাল মেরামত করছিল যে দু-জন, তারা শাজাহানকে ধরে রাখতে পারছিল না।

ঋজুদা শাজাহানের দিকে না তাকিয়ে ঐ লোকগুলোকে জিগ্যেস করল, কী হয়েছিল বলো ?

ওরা বলল, মীরজাফর একা নৌকোতে ছিল। আগের দিন ও নোঙর তোলার সময় পায়ে একটু চোট পেয়েছিল। বলল, তোমরা যাও চাচা, আমি বসি। এখান থেকে তোমাদের তো দেখাই যাবে। ওরাও জল কাটতে-কাটতে মীরজাফরকে দেখতে পাচ্ছিল। মীরজাফর ঘষে-ঘষে পায়ে শর্ষের তেল লাগাচ্ছিল। এমন সময় ওদের চারজনের বিস্ফারিত চোখের সামনে একটা বিরাট বাঘ ঘাসবন থেকে বেরিয়ে বালির উপর দিয়ে নিঃশব্দে দৌড়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে মীরজাফরের ঘাড় কামড়ে ওকে নিয়ে অর্ধ-গোলাকার একটা চক্কর মেরে জঙ্গলে ঢুকে গেল বালি পেরিয়ে।

মীরজাফর কোনো শব্দ করবারও সময় পায়নি।

ঋজুদা আমাকে বলল, রুদ্র, তুই বোটে থাক। বোট ছোট-বালিতে নোঙর করে রাখবি। রাইফেলে গুলি ভরে নীলমণির কেবিনের মধ্যে চারদিকের পর্দা উঠিয়ে সজাগ হয়ে বসে থাকবি। কেউ যেন বোট থেকে বালিতে না নামে।

বলেই, নীলমণিকে বোট এগিয়ে নিয়ে বালিতে যেতে বলল।

বোটটা এগোতে লাগল যখন, তখন বলল, আমি যদি সন্ধের মধ্যে না ফিরি তাহলে বোট খুলে তোরা সোজা ক্যানিং চলে যাবি। পুলিসে রিপোর্ট করে কলকাতা ফিরে যাস।

নীলমণিকে আরও কীসব বলল ঋজুদা। গদাধরকে বলল,

শাজাহানরা সকলেই এখন আমাদের সঙ্গেই থাকবে। ওদের জন্যে রান্না করিস।

এত সব কাণ্ড, কথাবার্তা কিছুই মগজে ঢুকছিল না আমার।

যখন হঠাৎ বুঝলাম যে, ঋজুদা সন্ধের আগে না-ফিরে আসা মানে ঋজুদা আর কোনোদিনই ফিরবে না, তখনই প্রথম পুরো ব্যাপারটার ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন হলাম।

মীরজাফর যেমন আর ফিরবে না, ঋজুদাও নয়!

বোটের নোঙর ফেলল পরেশ আর নটবর। কাঠের সিঁড়িটা নামানো হল বালিতে বোট থেকে নামার জন্যে। ঋজুদা নেমে যাওয়ার আগে একবার পিছন ফিরে তাকাল।

আমি হঠাৎ বললাম, ঋজুদা, আমি যাব।

ঋজুদা কঠিন গলায় বলল, একদম না। যা-যা বললাম সেই মতো কাজ করবি।

গদাধর কী যেন বলতে গেল, কিন্তু ঋজুদা তা শোনার জন্যে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে বালিতে নেমে যেখানে মীরজাফরদের নৌকো ছিল সেখানে সোজা চলে গেল, গিয়ে বালিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে দেখে এগিয়ে চলল। ঋজুদা ফোর-ফিফটি-ফোর হাণ্ড্রেড ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা না নিয়ে থ্রি-সিক্সটি-সিক্স ম্যানলিকার রাইফেলটা নিয়ে গেলো দেখলাম।

ছোট নৌকোর লোকগুলো বলল, বাবু ঠিক যেতিচেন, ঐ পথেই মামা মীরজাফরকে মুখি করে···

শাজাহান নিচু গলায় বলল, বাপজান!

আমি ঋজুদাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এইবার ষড়-বড় ঘাসের মধ্যে ঢুকে পড়বে। ঋজুদার গায়ে একটা খাকি হাফ-হাতা সোয়েটার

সবুজ হাফশার্টের উপর। শর্টস, আর পায়ে গলফ খেলার জুতো। শেষ-বার দেখা গেল। তারপর ঋজুদা অদৃশ্য হয়ে গেল।

শাজাহান আবার বলল, মীরজাফর, মীরজাফর! বেইমান কুথাকার! বুড়া বাপকি এইভাবে মেইরে যেতি হয় বাপ?

ঋজুদা চলে যেতে আমি নীলমণিকে শুধোলাম, ক'টা বাজল নীলমণি?

নীলমণি হাতের ঘড়ি দেখে বলল, আটটা বাজে।

বলেই বলল, সাতসকালে এমন ঘটনা!

জোয়ার বারোটা নাগাদ পূরো হয়ে যাবে। তারপর ভাঁটি দিতে শুরু করবে। তারপর আবার জোয়ার ঘুরে আসবে।

নীচে থেকে ঋজুদার ফোর-ফিফটি ফোর হাণ্ড্রেড ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা এনে দু-ব্যারেলেই গুলি ভরে আমি সারেঙের কেবিনে এসে বসলাম। একটু রোদও যেন উঠেছে বলে মনে হল। মেঘ অনেকটা কেটে গেছে। মাথার উপরে সূর্য মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিচ্ছে এখন। হাওয়া না থাকলেও ঠাণ্ডা আছে বেশ।

মেঘ কেটে গেলে আরও ঠাণ্ডা পড়বে, নীলমণি বলল।

শাহাজানকে অন্যান্যরা ঘিরে ছিল। বুড়ো যেন পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু কথা বিশেষ বলছে না। শুনেছিলাম, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। ছেলে-হারানো শাজাহান বুড়োকে দেখে এই প্রথম বুঝলাম কথাটার মানে।

আমি ভাবছিলাম যে, এখন না হয় আমরা আছি। মোটর বোট, লোকজন, রাইফেল-হাতে শিকারী। কিন্তু ওরা তো এমনি করেই দিশি নৌকোয় দিনের পর দিন ঝড়ে, জলে, শুক্লপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষে

সুন্দরবনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়! কী দুঃসাহস এদের! মৃত্যুর সঙ্গে একঘরে বাস করে এরা। সহায়-সম্বলহীন, প্রতিকারহীন গরিব লোকগুলো। আমরা নিজেদের কখনও-কখনও কত না সাহসী বলে মনে করি। কিন্তু এদের তুলনায় আমাদের সাহসের দাম কানাকড়িও নয়।

যে লোক দুটো খেপলা জাল মেরামত করছিল তাদের মধ্যে একজন বোটে এল জল খেতে। আমি তাকে কাছে ডেকে বসালাম। যারা মীরজাফরের সঙ্গে জল কেটে নিতে নেমেছিল ডাঙায়, তাদের মুখ দেখে মনে হল, মীরজাফরের বদলে তাদের কাউকে যে নেয়নি তাতেই তারা খুশি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষরা বড় স্বার্থপর হয়ে ওঠে। দোষ দেওয়া যায় না ওদের। মৃত্যুভয় এমনই!

সেই লোকটাকে জিগ্যেস করলাম যে, আমরা যদি এখন এখানে না থাকতাম তবে ওরা কী করত?

ও সাদামাটা গলায় একটুও নাটক না করে বলল যে, করার আর কী ছিল? যেখানে বাঘে নিয়েছে মীরজাফরকে, সেখানে একটি ঝামটি পুঁতে দিয়ে ওরা চলে যেত। কিন্তু যাওয়ার আগে ওদের জল-কেটে নিতেই হত। না হলে পিপাসায় মরতে হত। বাঘের হাতে মরলেও মরা; পিপাসায় মরলেও মরা। বাঘ তক্ষুনি মানুষ নিয়েছে—তাই বাঘ তখন খেতে ব্যস্ত থাকবে। তখনকার মতো অন্য মানুষরা নিরাপদ। এই ভরসায় ওরা তাড়াতাড়ি জল কেটে নিয়ে আবার বাধ-জাল ফেলার জন্যে খাঁড়ি বা খালে যেখানে ওদের যাওয়ার, সেখানে চলে যেত। মীরজাফরের বাবা ছেলের জন্যে শোক করার সময়ও পেত না হয়ত। গরিবের সময় কোথায় শোক করার? এতক্ষণে শাজাহান হালে বসে থাকত দূরের জঙ্গলের দিকে চেয়ে।

ঝপাত ঝপাত করে দাঁড় পড়ার শব্দ হত জলে। পাড় থেকে জোয়ারি পাখি ডাকত পুত্‌ পুত্‌ পুত্‌ পুত্‌ করে। শাজাহানের দু চোখের নোনা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে সুন্দরবনের নোনা নদীর জলে মিশে যেত। শাজাহানও যেন তার স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে জোয়ারি পাখির পুত্র হারানোর দুঃখে একাত্ম হয়ে যেত।

জোয়ারি পাখির পুত ভাসিয়ে নিয়েছিল জোয়ারে, আর শাজাহানের পুত নিয়েছে সুন্দরবনের অমোঘ নিয়তি—বাঘে।

এবার রোদ বেশ উঠেছে। দূরের জঙ্গলের সাদাবানী গাছগুলোর সাদা নরম গায়ে রোদের সোনা লেগেছে। আকাশটা কী দারুণ নীল! কিন্তু রোদটার যেন জ্বর হয়েছিল। এখনও কেমন নিস্তেজ। বড়-বড় কেওড়া গাছগুলোর ডালপালা ছড়িয়ে গেছে দূরে-দূরে। হরিণ চরে বেড়াচ্ছে তার নীচে-নীচে। রোদ ওঠায় বাঁদরগুলোর আনন্দ বুঝি ধরে না। হুপ্‌-হাপ্‌ চিৎকারে বন-সরগরম করে তুলেছে। একটা মাঝারি কুমির ছোট-বালিতেই, কিন্তু অনেক সামনে ধীরে ধীরে জল থেকে তার গা-ঘিনঘিন খাঁজকাটা শরীরটাকে তুলে বালিতে পোড়া-কাঠের মতো স্থির হয়ে রয়েছে। রোদ পোয়াচ্ছে কুমিরটা।

সুন্দরবনের কুমির লেজের বাড়ি মেরে মানুষকে নৌকো থেকে জলে ফেলে মুখে করে নিয়ে যায়। আবার কত লোক নৌকোয় বসে জলে পা ডুবিয়ে পা ধুতে গিয়ে পা খুইয়েছে হাঙরের মুখে। হাঙরের দাঁতে এমন ধার যে যখন কাটে, ঠিক তখন তেমন বোঝা পর্যন্ত যায় না যে কাটল।

নীচে গদাধর মশলা বাটছিল, তার গাবুক-গুবুক আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আমি বললাম, গদাধরদাদা, তুমি দেখি ফিস্টি শুরু করে দিলে। ফেনাভাত কি খিচুড়ি যা হয় একটা চাপিয়ে দাও। খিদে

কারোরই নেই। তুমি যে নেমন্তন্ন-বাড়ি করে তুললে দেখছি বোটটাকে।

তারপর একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, এত আনন্দ কিসের?

গদাধর বল, তাতেই তো। আনন্দ একশবার। আজকে আমার বাপের শত্রুর ছেরাদ্দ করবে দাদাবাবু—তাইই তো রাইফেল নে বাঘের পেছনে গেল। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমি দেখতে চাই শয়তানটার চেহারা। দাদাবাবু এখন তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক।

সেইটেই ভাবার কথা। আর কে কী ভাবছিল জানি না, আমি কিন্তু ঋজুদা নেমে যাওয়ার পরই আমার মনের স্টপ-ওয়াচ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। টিক্ টিক্ করে তারপর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আমার বুকের মধ্যে শব্দ করছিল। সদ্য কিল-করা বাঘ অথবা গুলি-খাওয়া বাঘকে ফলো করতে যে কত সময় লাগে—এক গজ জায়গা পেরোতে যে কী সাবধানতা ও স্নায়ুর জোরের দরকার হয় তা যাঁরা করেছেন কখনও, একমাত্র তাঁরাই জানবেন।

মনে মনে একটা হিসেব করছিলাম, ঋজুদা কত দূর গেছে এতক্ষণে? বাঘটা এখন কী করছে? ছোটবালিতে কি এখন একটাই বাঘ আছে? যদি ঋজুদাকে অন্য বাঘে পিছন বা পাশ থেকে আক্রমণ করে?

কিছু ভাল লাগছিল না। আরও খারাপ লাগছিল, ঋজুদা আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না বলে। এমন এর আগে মাত্র একবারই করেছিল ঋজুদা। লবঙ্গীর জঙ্গলে একটি বাঘ ঋজুদার কলকাতার এক সাহেব-বন্ধুর গুলিতে আহত হয়। আহত হয় বীটিং শিকারে। সেই বাঘকে খুঁজে মারার সময় কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নেয়নি।

সঙ্গে নিয়েছিল শুধু ঋজুদার ওড়িশার জঙ্গলের বন্ধু চন্দ্রকান্তকে। কিন্তু অন্যান্য সব জঙ্গল একরকম, আর সুন্দরবন অন্যরকম। তাও ছোটবালিতে বালি থাকায় হাঁটা চলার সুবিধে। সুন্দরবনের অন্যান্য জায়গায় যে জুতো পরে হাঁটা পর্যন্ত যায় না। খালি পায়ে কাদার মধ্যে হেঁটে দেখেছি। পা সামলাব, না কেওড়ার শুলো সামলাব, না বাঘের দিকে চোখ রাখব? রাইফেল-বন্দুক হাতে যখন-তখন কাদার উপর ঝপাং করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর শুলোর উপর পড়লে তো ছুরিবিদ্ধ হবার মতই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতে হবে।

বেলা বাড়ছিল। দূরের বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে আমি ভাবছিলাম, লোথিয়ান্ আইল্যাণ্ড, ভাঙাডুনি আইল্যাণ্ড, আর মায়া দ্বীপের কথা। মায়া দ্বীপের নাম শুনলেই যেন মনটা কেমন করে। মায়া দ্বীপই বটে।

শাজাহানের নৌকোর সেই লোকটি আমার পাশে বসে নানা গল্প করছিল। আজ তাদের রান্না করে খেতে হবে না। সুন্দরবনে এমন নেমন্তন্ন ওরা কখনও বোধ হয় খায়নি। একটু খাওয়া, এক বেলা; তাতেই কত খুশি ওরা। কত কৃতজ্ঞ। খিদে বুঝি বাঘের চেয়েও ভয়ংকর—তাই তো ওরা খিদেয় মরার চেয়েও বাঘ, কুমির, হাঙরের মুখে মরাকে অনেক কম কষ্টের বলে মনে করে।

ও গল্প করছিল, একবার ওরা মাছ ধরছিল চামটাতে—বড় চাম্‌টায়। গরমের দিন। অনেক গোলপাতা কাটার নৌকো এসেছিল। তার মধ্যে বড়-বড় মহাজনী নৌকোও ছিল। শুক্লপক্ষ। সেবার বাঘের বড় উপদ্রব। চাম্‌টাতে উপদ্রব বরাবরই একটু বেশি। সারাদিন যে যার কাজ করে চাম্‌টার খালের মাঝে সব নৌকো পাশাপাশি লাগিয়ে রাতে থাকত ওরা। বাউলে, মউলে, জেলেরা

সব একসঙ্গে ; বাঘের ভয়ে।

লোকটা একটা বিড়ি ধরাল। হঠাৎ কোনো একজন মাঝি চেঁচিয়ে উঠল, সামনে বালির ওপাশে বড়-বড় কোমরসমান ঘাসি বনে লাল মতো কী যেন একটা জানোয়ার দেখেছে সে এক ঝলক।

আমি তাড়াতাড়ি তাকালাম সেদিকে। কিছুই দেখতে পেলাম না। ঘাস-বন দোলাদুলি করছিল, কিন্তু তা হাওয়ার জন্যেও হতে পারে। তবু, সাবধানে, কোনো কথা বা গল্প না করে ভাল করে নজর করতে লাগলাম সামনের তিনদিকে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর লোকটা আবার নিজের মনে গল্প করে যাচ্ছিল। এমন মেহনতহীন অবকাশে একটু পেট পুরে খাওয়ার স্বপ্নে যেন লোকটা বুঁদ হয়ে ছিল।

ও বলছিল, সেদিন পূর্ণিমা কী তার আগের দিন। ফুট্-ফুট্ করছে জ্যোৎস্না। নদীর জলে চাঁদের মুখ যেন লক্ষ লক্ষ চাঁদ হয়ে ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় আয়নার মতো ভাঙছে আর চুরছে। হাওয়া বইছিল এলোমেলো। জঙ্গল থেকে লতা পাতা ফুল, সোঁদা মাটি সবকিছুর গন্ধ ভেসে আসছিল সেই হাওয়ায়। ওদের নৌকোটা একটা বড় গোলপাতার নৌকোর গলুইয়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। সেই বড় নৌকোর সঙ্গের জালি-বোটে রান্না করছিল একজন। তার গাবুক-গুবুক করে মশলা বাটার আওয়াজ ভেসে আসছিল। কষে মশলা বাটার জন্যে জালিবোটটাও হেলছিল-দুলছিল।

আমি বললাম, তোমরা কী করছিলে তখন ?

আমরা আর কী করব ? আমরা তো সন্ধ্যে হতি-না-হতিই খাওয়া-দাওয়া সারি।

বাঘের উপদ্রবের জন্যে রেঞ্জার সাহেবের বোটও সেখানে ছিল।

সবসুদ্ধু ছোট-বড় মিলিয়ে খান দশ-বারো নৌকো। আর চাম্‌টার খাল তো আপনাদের দেখাই। সুন্দরবনের বাদার খাল তো আর আপনাদির আদি গঙ্গা লয়, বেশ চওড়াই। বাউলি নৌকো থেকে কে যেন গলা ছেড়ে গান ধরেছিল। আমরা খাওয়ার পর বিড়িতে দুটান দিয়ে শুয়ে পড়েছি। মুখের উপর চাঁদটা ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে। সুঁতিখালের মধ্যে সাপে মাছ তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। তার হুত্‌লি-পুত্‌লি শব্দ শুনতিচি শুয়ে-শুয়ে। এমন সময় ঝপাং করি একটা হালকা আওয়াজ। আমি ভাবলাম, গোলপাতার বড় নৌকো থেকে কোনো নোক বুঝি লাফ দে নামল রান্নার নৌকোয়। খানিক পরে শুনি হৈ-হৈ উঠল চারপাশ থেকে। তাড়াতাড়ি পাটাতনে উইটে বসে দেখি, জলের মধ্যে একটা কালো বড় জালার মতো গোল বাঘের মাথাটা ভেইসে যাইছে আর তার মাথার একদিকে একটা মানুষের উঁচু-হয়ে-থাকা কাঁধ আর হাত সেই সঙ্গেই ভেইসে ভেইসে চলেছে।

নিল রে নিল, জানোয়ারে নিল বলে চিৎকার উঠল চারধার থেকে। রেঞ্জার সাহেব লুঙ্গি-পরে ডেকচেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন, দৌড়ে গিয়ে বন্দুক এনে দমাদ্দম করে ফাঁকা আওয়াজ করলেন গোটা চারেক। কিন্তু বাঘের দিকে গুলি করতে পারেন না, পাছে রাজেনের গায়ে লেগে যায় গুলি।

ঐ হট্টগোল আর গোলাগুলির পরও বাঘ রাজেনকে ছাড়ল না। লোকটার নাম ছিল রাজেন দেয়াসি। দেয়াসির ছেলে সে। তারেও ছাড়ল না বাঘ। বাঘ সোজা সাঁতার কেইটে পাড়ে গিয়ে রাজেনকে মুখ থেকে উগরে ফেলার মতো করে উগরে ফেলে হ্যাঁতালের ঝোপে ঢুকে গেল।

অমনি বোট খুলে, সার্চ-লাইট জ্বেলে, বন্দুক লোড করে রেঞ্জার সাহেব এগুলেন। সঙ্গে ছোট ছোট নৌকো নিয়ে আমরাও বোটের পিছন পিছন। অনেক চিৎকারে নদী জমিয়ে, জঙ্গল ফাটিয়ে ওপারের কাছাকাছি গিয়ে দেখি বাঘ তো চলে গেছে, কিন্তু তিলের নাড়ু চিবোনোর মতো করে রাজেনের মাথাটাকে চিবিয়ে রেখে গেছে বাঘ।

ওর গল্প শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই পূর্ণিমার রাতের দুর্ঘটনার বিভীষিকা আমার মাথার মধ্যে শীত-শীত ভাব রেখে গেল একটা।

আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য এবার পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছে। ভাঁটি পুরো হবে বিকেল চারটে নাগাদ। তার পর আবার জোয়ার দেবে।

ততক্ষণে গদাধরের রান্না হয়ে গিয়েছিল। নীলমণি, পরেশ, নটবর ও গদাধর সকলকে যত্ন করে খাওয়াচ্ছিল। ফেনাভাত, ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, পাঁপড় ভাজা আর আচার। শাজাহান খেল না কিছুতেই।

আমি অনুরোধ করায় বলল, খোকাবাবু, খাব, খাব। সবই করব। খাদ্য-খাদক খাব, ঘুমোব, আবারও মাছ ধরব, কিন্তু একটু সময়ের পেরোজোন। আমার মীরজাফর আর তুমি বরাবরই হবে বয়সে। কিন্তুক আমার যে বাপ, মীরজাফর ছাড়া আর কেউ ছেলনি —বুড়ো বয়সে দানাপানি দিবে এমন কেউ তো আর লাই—যতদিন বাঁচি এই হতচ্ছাড়া পেটটার জন্যি আমাকে তো এই সব্বনেশে বাদায় আসতিই হবেক।

তারপরই গলা তুলে একটা গাল দিয়ে বলল, হতচ্ছাড়া জানোয়ার, তুই আমাকে নেলি না কেন? তুই আমার সোনার পুতটারে নেলি

কী আইক্কেলে ?

নীলমণি আমাকে বলল, রুদ্রদাদা, ওকে জোর না করাই ভাল। ওকে একটু সময় দিতে হবে।

পরেশ লাল লুঙ্গিটা কোমরে দু-পাট্টা করে জড়িয়ে মহা বিজ্ঞের মতো আমাকে ফিসফিস করে বলল, সময় সব ভুলিয়ে দেয়—শোক লিশ্চয় ধুয়ে লিবে সময়, এই মাতলা গোসাবা হেড়োভাঙার জলে। সবাই ভোলে সবাইকে। এই দুদিনের কান্নাই সার গো। দুদিন বই লয়। বুড়োর আর ছেলে নেই বইলে শোকটা বড় নেগেছে। খাওয়াবে কে রোজগার কইর‍্যে ? না খাটতি পারলি উপবাস। ছেলেটা মইর‍্যে বাঁচল দুঃখ কষ্ট থেইকে, আর তার বুড়ো বাপ বেঁইচে মরল। কী বলা দাদাবাবু ?

ওরা যখন খাওয়া-দাওয়া করছে, খেতে-খেতে দু-একটা কথাও বলছে, এমন সময় জঙ্গলের গভীর থেকে গুড়ুম্ করে একটা গুলির শব্দ হল। রাইফেলের গুলির আওয়াজ।

বঙ্গোপসাগর থেকে হাওয়া যেন শব্দটাকে উড়িয়ে নিয়ে এসে বোটে আছাড় মেরে ফেলল। আমরা বোটে, নৌকোয়, যে যেখানে ছিলাম, কান খাড়া করে রইলাম।

কিন্তু তারপর সব চুপচাপ। আর কিছু শোনা গেল না।

আমি জানি, বড় বাঘের বেলা কোনো চান্স্ নেয় না ঋজুদা। এক গুলিতে বাঘ পড়ে গেলেও আরও একটি গুলি করে বাঘের বাঁচার বা আক্রমণের সম্ভাবনাকে নির্মূল করে।

কিন্তু একটিই গুলি হল। এবং গুলি হওয়ার একটুক্ষণ পরেই বাঘের প্রচণ্ড গর্জনে সমস্ত ছোটবালি যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। খালের বুকের জলও যেন ভয়ে টলটল করে উঠল।

কিন্তু আর গুলি হল না। সমস্ত জঙ্গল নিথর হয়ে গেল। শুধু হাওয়ার শব্দ, জলের শব্দ, পাতায়-ঝোপে হাওয়ার অস্থির হাত বুলোনোর খস্‌খসানি। জলের লক্ষ লক্ষ বিভিন্নাকৃতি আয়নায় আলোর মুহুর্মুহু প্রতিফলন, প্রতিসরণ; নড়া-চড়া।

আমাকে প্লেটে করে একটুখানি ফেনাভাত এনে দিয়েছিল গদাধর সারেঙের কেবিনেই। দু'পা ছড়িয়ে, কেবিনে হেলান দিয়ে বসে, দুই উরুর উপরে রাইফেলটাকে শুইয়ে রেখে আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম।

সকলেই বালির দিকে তাকিয়ে বাবুর বা দাদাবাবুর কী হল তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। আমিও তা করছিলাম, মনে মনে। একটা গুলি হল, তারপর আর গুলি হল না কেন? বাঘ গর্জন করে উঠল। যদি বাঘ মরে গিয়ে থাকে তবে ঋজুদার ফিরে আসা উচিত। বড় জোর আধ ঘণ্টার মধ্যে। কারণ গুলির আওয়াজ ও বাঘের গর্জন যেখান থেকে হল তা জল থেকে বেশি ভিতরে নয়।

আধ ঘণ্টা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর আমার অস্বস্তি হতে লাগল। কিন্তু এখানে আমিই ঋজুদার রিপ্রেজেণ্টেটিভ্। আমি ছোটই হই আর যাই-ই হই, ঋজুদা বোট থেকে নেমে যাওয়ার পর আমাকেই যা কিছু ডিসিশান নেবার তা নিতে হবে। একা একা। এখন যা কিছু করব তাতে কাউকে জিগ্যেস করার নেই।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। বিকেল চারটে নাগাদ ভাঁটি পুরো হয়ে গিয়ে আবার জোয়ার দেবে। নিস্তেজ রোদটা বোধ হয় সরে যাবে একটু পরে। গুলির শব্দ হওয়ার পরে প্রায় দু'ঘণ্টা হয়ে গেছে।

এখনও ঋজুদার দেখা নেই। ঋজুদা বলে গিয়েছিল আমাদের সন্ধে অবধি দেখতে, তারপর ক্যানিংএ চলে যেতে।

অমন বললেই তো আর হয় না। ফিরে গিয়ে সবাইকে কী বলব? ঋজুদা বাঘের পিছনে নেমেছিল, তারপর গুলির শব্দ ও বাঘের গর্জন শুনলাম এবং তারপরও আমি হাতে-রাইফেল ধরা শিকারী হয়েও কী হল তার খবর না নিয়েই বোট নিয়ে ফিরে যাব ক্যানিংয়ে!

গায়ে থুথু দেবে না সকলে? দুয়ো দেবে বন্ধুরা। মুখ দেখাতে পারব না কোথাও ভীরু বলে।

আর ঋজুদা? ঋজুদাকে ফেলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

নীলমণির ঘড়িতে যখন তিনটে বাজল তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আমি নামব। এতক্ষণ হয়ে গেল, এবার খোঁজ করতে হয়।

গদাধর বলল, খবরদার লয়। দাদাবাবু যা পারে, তুমি কি তাই-ই পারো? তোমারে বাঘে নেলে, দাদাবাবু ফিরি এইলে আমরা বলব কী তেনারে? ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতো থাক দিকিনি, রুদ্রবাবু।

আমার রাগ হয়ে গেল। আমি বললাম, ছেলেমানুষ ছেলে-মানুষ বলবে না বারবার।

শাজাহান বুড়ো ছইয়ের নীচে শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়েই বলল, যেইও না বাপ্। এ ঠাঁই বড় কঠিন ঠাঁই। বুইঝতে পর্যন্ত পারবেনি কোথা থেকে কী হয়। এমন কম্ম করোনি বাপ্—তুমার বাপেরও কি এই বুড়োর দশা কইরবে?

আমি ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা পর-পর ভাবলাম। ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রস্ অ্যাণ্ড কন্স্'। এক এক করে ভাবলাম।

১) হয়তো ঋজুদার কোনো বিপদ হয়নি। খুব ভাল কথা। তাহলে ঋজুদা সন্ধের আগে বোটে ফিরে আসবে।

২) হয়তো ঋজুদার বিপদ হয়নি, বাঘকে এক গুলিতেই মেরেছে।

ওখানে একাধিক বাঘের পায়ের দাগ দেখেছে বলে হয়তো গুলি অযথা নষ্ট করতে চায়নি। হয়তো মীরজাফরকে বয়ে নিয়ে রাইফেল কাঁধে করে এবং চারদিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে আসতে অনেক সময় লাগছে।

৩) হয়তো বাঘ ঋজুদাকে কিছু করেছে। ঋজুদাকেও···

৪) হয়তো যে-বাঘকে গুলি করেছে ঋজুদা সে অন্য বাঘ। মীর-জাফরকে এখনও খুঁজেই পায়নি ঋজুদা এবং এখনও হয়তো যে-বাঘ মীরজাফরকে নিয়েছে তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে।

৫) যদি সন্ধে অবধি ঋজুদা ফিরে না আসে তাহলে আমার কিছুই করার থাকবে না। অন্ধকারে রাইফেল হাতে থাকলেও এই সুন্দর-বনের জঙ্গলে যে-বাঘ সদ্য মানুষ নিয়ে গেছে তাকে অনুসরণ করার ক্ষমতা বা সাহস আমার নেই। তাই সন্ধে অবধি ঋজুদা সত্যি-সত্যিই না ফিরলে পরদিন ভোরের আগে আমার করার কিছুই থাকবে না। ঋজুদার যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয়ে থাকে; তাহলে সন্ধে নামার অনেক আগেই সেই সাহায্য পৌঁছাতে হবে আমার।

অনেক ভাবলাম, কিন্তু ভাবতে সময় লাগল না বেশি। আমার মাথা যেন তখন কম্প্যুটরের মতো কাজ করতে লাগল। মহা বিপদে পড়লে অনেক সময় এ রকম হয়।

অনেক ভেবে আমি নেমে যাওয়াই ঠিক করলাম। ভয় যে করছিল না তা নয়, বেশ ভয়ই করছিল।

আমি ওদের শক্ত গলায় বললাম যে, আমি যাচ্ছি ঋজুদাকে দেখতে।

পরেশ, নটবর, গদাধর নীলমণি সব হাঁ-হাঁ করে উঠল। বলল, ছেলে-মানুষি কোরো না। তারপর তুমিও না এলি আমাদের যে হাজত বাস

করতি হবে সারাজীবন। আমরা যে তুমাদের জলে ফেইলে দিই আসিনি, এ-কথা কেউ কি বিশ্বাস করবে?

আমি বললাম, সময় নষ্ট করার সময় নেই। আমি যাচ্ছি, তোমরা সাবধানে থেকো। সবাই একসঙ্গে।

তারপর বেল্টের সঙ্গে টর্চটা বেঁধে নিয়ে, আমি রাইফেল রেখে ডাবল-ব্যারেল বন্দুকটা নিলাম। দুটো গুলি পুরলাম ব্যারেলে। ডানদিকে ফেরিকাল বল আর বাঁদিকে এল-জি। আরও চারটে গুলি পকেটে নিলাম।

গদাধর বলল, রুদ্রদাদা, আমাদের কথা ভাবো। কী চিন্তায় যে পড়লাম আমরা—কত চিন্তায় যে থাকব।

তারপর বলল, খুব সাবধান, বিশেষ সাবধান হইয়ে যেও।

শাজাহানের নৌকোয় একটি অল্পবয়সী ছেলে, আমার চেয়ে সে বছর তিন চারের বড় হবে জোর, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আম্মো যাব।

বোট ও নৌকো দুটোর সক্কলের চোখ ছেলেটার মুখে পড়ল। একটা খয়েরি লুঙ্গি, গায়ে একটা নীল-রঙা ছেঁড়া সুতির শার্ট।

ছেলেটি বলল, বাবুসক্কল আমাদের মীরজাফরের জন্যেই এত ঝুঁকি লিইতেছেন, আর আমি ওনার সঙ্গে যেতি পাইরব না?

শাজাহান বিড়-বিড় করে বলল, সিটা তো গেছেই, সিটা কি আর বেঁইচে আচে এতক্ষণ। আবার তুরা মইরতে যেইতিচিস কেন?

তারপরই বলল, বুঝি না; বুঝি না।

আমি বললাম, না। তুমি থাকো ভাই। আমি একাই যাব!

ছেলেটি হাসল। এক অদ্ভুত হাসি দেখলাম ওর মুখে।

ও যেন বলল, শহুরে সৌখিন শিকারী খোকা, তুমি এ বন-

জঙ্গলের ঘোঁত-ঘাঁত্ জানোনি—তুমি একা নামলি সঙ্গে সঙ্গে বাঘের খাদ্য-খাদক হইয়ে যাবে। আমি সঙ্গী থাকলি তুমারই মঙ্গল। আমরা তো খালি হাতেই যাই রোজদিন—পেইটের লিগে! আর তুমার হাতে তো টোটা-ভরা বিলাতি বন্দুক। আমার ভয়টা কিসের ?

ছেলেটি গামছাটাকে কোমরে বেঁধে নিল। তারপর আমার আগে আগেই নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। মুখে বলল, চলো।

তারপর বোটের উপরে আর নৌকোয় দাঁড়িয়ে থাকা ওদের সকলকে বলল, ভয় নাই কোনো খোকাবাবুর জন্যি, আমি সঙ্গে যেতিচি।

শাজাহান উঠে এসে নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, খুদাতাল্লা, দোয়া রেইখো ছোঁড়াদের পরে।

৬

কিছুক্ষণের মধ্যে ঝুরঝুরে বালি পেরিয়ে ঘাসি বনে ঢুকে পড়লাম আমরা।

নোঙর করা বোটটাকে দেখা যাচ্ছে না আর। তবে অনেক দূর অবধি ওদের কথা শোনা যাচ্ছিল। কত আস্তে কথা বলছিল ওরা, কিন্তু কতদূর অবধি তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বাসনে-বাসনে ধাক্কা লেগে টুং-টাং আওয়াজ হল, তাও শোনা গেল কতদূর থেকে।

ছেলেটির নাম সবীর। সে বলল, আমি তুমারে রাস্তা দেখায়ে

ঠিক নে যাব। সামনের দিকে চোখ থাকবে আমার, তুমি পাশে আর পিছনে চোখ রেখো।

তারপর আবার বলল, খুব সাবধান খোকাবাবু!

ঐ ভয়াবহ পরিবেশে আমার পথপ্রদর্শক পরমবন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সবীরের উপর রাগ হল আমার ভীষণ, আমাকে খোকাবাবু বলল বলে।

কিছুদূর গিয়ে একটা ট্যাঁকের মতো জায়গায় পৌঁছলাম আমরা। ঘাসি জায়গাটা। মধ্যে ফাঁকা মাঠ, তাতে ঘাস। তিনদিকে সাদাবানী আর সুন্দরী গাছ আর এক পাশটায় খোলা সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। হলুদ গায়ে কালো বুটি দেওয়া একদল চিতল হরিণ চরে বেড়াচ্ছিল ঘাসিবনে। আমাদের সাড়া পেয়ে টাঁউ টাঁউ টাঁউ করে ডাকতে ডাকতে ওরা যেন উড়ে গেল সেই ঘাসে ভরা মাঠের উপর দিয়ে।

সবীর বলল, একটা মারলে না কেনে গো, মাংস খাওয়া যেত পেট ভরে।

আমি ওর কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলাম।

আজই সকালে ওদের সঙ্গীকে ওদেরই সামনে বাঘে মুখে করে নিয়ে গেল। এই মুহূর্তেও মাটিতে নেমে আমরা দুজনে সর্বক্ষণ প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে রয়েছি। ঠিক সেই সময় গাছ থেকে একটা সরু ডাল ভেঙে কান চুলকোতে চুলকোতে কী করে যে হরিণের মাংস খাওয়ার কথা বলল ও, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না আমি।

আসলে আমরা অন্য গ্রহের লোক। এই সবীর, শাজাহান, মীরজাফরের মতো বেপরোয়া গরিবদের আমরা চিনি না, কখনও হয়তো তেমন করে চেনার চেষ্টাও করিনি। খাদ্য-খাদক ওদের জীবনে এতখানি স্থান জুড়ে আছে যে, তা ছাড়িয়ে অন্য অনেক বড় কিছুই সে

জীবনে প্রবেশাধিকার পায় না।

সবীর ফিসফিস করে বলল, দাঁড়াও, গাছে উঠে চারদিকে দেখি।

আমি সাবধানে গাছেব গুঁড়ির আড়ালে পেছন দিকটা কভার করে দাঁড়ালাম, বন্দুক রেডি-পজিশানে ধরে। সবীর তরতর করে গাছে উঠল।

হঠাৎ, দূর ব্যাটা! বলল সবীর। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার সামনেই গাছ থেকে থপ্ করে কী একটা পড়ল। চমকে দেখি একটা সাপ। উলটো হয়ে পড়ল বলে সাপটার পেটের দিকের সাদাটে-সব্জে রঙটা চোখে পড়ল। পরক্ষণেই সোজা হয়ে একটা ডিগবাজি খেয়ে সাপটা প্রচণ্ড বেগে ঘাসবনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হরিণগুলো দূরে গিয়ে বার বার ডাকতে লাগল। পুরুষগুলো টাঁউ, টাঁউ, আর মেয়ে হরিণগুলো টিঁউ টিঁউ টিঁউ করে ডাকছিল।

সবীর গাছ থেকে নেমে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, নাঃ কোনো হদিশই লাই। তারপর বলল, চলো।

আমি বললাম, আন্দাজে ঘুরে লাভ কী? তার চেয়ে বাঘের পায়ের দাগ দেখে দেখে গেলে ভাল হত না?

সবীর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। বলল, বাঘের পায়ের দাগ? দেখতে চাও? বলেই, ও বাঁদিকে মাথা নিচু করে কিছু দূরে হেঁটে গেল। তারপর আমাকে বলল, লাও, আশ্ মিইট্যে দেকো।

দেখি, বালির উপর বাঘেদের প্রসেশানের দাগ। কত বাঘ যে এসেছে, গেছে—তার ইয়ত্তা নেই।

সবীর আঙুল তুলে বলল, ইখানে দেকো।

মুখ তুলে দেখি, সেই রাজপথের দুপাশের বড়-বড় গাছের গুঁড়ি বাঘের নখের দাগে ফালা-ফালা। বাঘেরা পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে

উঠে সামনের পায়ের থাবার নখ ধার করেছে ঘষে ঘষে—নখের মাংস, ময়লা পরিষ্কার করেছে।

ঐখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে হল যে, মিছিমিছি সময় নষ্ট করছি আমি। এবং হয়তো প্রচণ্ড বিপদের মধ্যেও আছি। সময় খুব কম। ঋজুদাকে খোঁজা আমার কাজ।

আমি ওকে বললাম সে কথা।—বললাম, এতই যখন তুমি জানো সবীর, ঠিক রাস্তা দেখিয়ে নে চলো তো।

ও বিড়বিড় করে বলল, সেই চেষ্টাই তো কইরতেছি। কতা কউনি। এক্কেরে চুইপটি মেইরে থাকো।

কিছু দূর গিয়েই একটা বাঘের টাটকা পায়ের চিহ্ন দেখলাম। খুব বড় বাঘ। মনে হল পুরুষ বাঘ।

সবীর মনোযোগ দিয়ে চিহ্নটা দেখল। তারপর পায়ে পায়ে এগোতে লাগল চিহ্ন দেখে।

আমি বললাম, আমি এবার তোমার সামনে যাই?

সবীর বলল, একদম না। এখানের বাঘে দণ্ডি কাটে।

মনে পড়ল আমার কথাটা। ঠিক। ঋজুদা আগে বলেছিল যে, এখানের বাঘ শিকারীকে এইভাবে ঠকায়। নিজে গোল হয়ে ঘোরে। শিকারী তার পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে যায়, এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে বৃত্তটাকে ছোট করে আনে বাঘ, তারপর নিজের সঙ্গে শিকারীর দূরত্ব কমে এলে এক লাফে পাশ থেকে ঘাড়ে পড়ে।

সবীর সাবধানে এগোচ্ছিল। আমিও সাবধানেই, ওর পেছন-পেছন।

বাঘের পায়ের দাগ ক্রমাগতই এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে দেখলাম।

ভয় পেয়ে, সবীরকে দাঁড় করিয়ে বললাম যে, কোথায় ঢুকে পড়ছ

দাগ দেখে? আমরা তো আর বাঘ মারতে আসিনি, ঋজুবাবু আর মীরজাফরকে খুঁজতে এসেছি। তুমি নিজেও মরবে, মারবে আমাকেও।

ও কথা বলতে মানা করল। হাত দিয়ে ইশারা করে।

ঠিক এমনি সময় আমাদের বোট থেকে খুব জোরে ভোঁ বেজে উঠল এবং একসঙ্গে অনেকে মিলে আমার ও সবীরের নাম ধরে ডাকতে লাগল বোট ও নৌকো থেকে।

তোমরা কেউ কখনও স্টীমার ও লঞ্চের ভোঁ শুনেছ কি না জানি না। যদি শুনে থাকো, তবে নিশ্চয়ই জানো যে, সেই আওয়াজে কোনো আরোহণ-অবরোহণ নেই। জলের উপর নির্জন জায়গায় তাই ঐ আওয়াজকে কোনো অতিপ্রাকৃত আওয়াজ বলে মনে হয়। একটানা বেজে আওয়াজটা ঝপ্ করে থেমে যায় একসময়।

সবীর থমকে দাঁড়াল। চোখে চোখে আমাদের কথা হল। তারপর সবীর বলল, খুব সাবধান। এখন বাঘের পথে পেছন ফিরনু আমরা। পেছনে ও পাশে বড় খর নজর রাইখতে হবে। জানোয়ার বড় ভীষণ। খুউব সাবধান!

আমি ভাবছিলাম যে, বোট থেকে বুঝি অনেকদূর চলে এসেছি। কিন্তু বোটের ভোঁ বাজতে এবং আমাদের জোরে ডাকাডাকি করাতে বুঝলাম যে খুব দূরে আসিনি আমরা! জঙ্গলে জলের ওপর শহরের লোকের পক্ষে দূরত্ব ঠাহর করা বড়ই মুশকিল।

জোরে জোরে পা চালিয়ে চলেছিলাম আমরা বোটের দিকে। বার বার দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনে মুখ করে চারপাশ ভাল করে দেখ-ছিলাম। যখন আমরা বালির তটের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম তখন সারেঙের উঁচু কেবিনে বসা নীলমণি আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এসেছে, এসেছে—বলে।

ঘাস পেরিয়ে বালিতে নামতেই যে দৃশ্য দেখলাম, তা আর কখনোই দেখতে চাই না এ জীবনে।

মীরজাফর বালিতে শুয়ে আছে। আস্ত মীরজাফর নয়। আধখানা মীরজাফর। ওর ডান হাত এবং বাঁ পাটা নেই। বালিতে একটা রক্ত-পিণ্ডর মতো পড়ে আছে ও।

ঋজুদা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের দিকে, মানে আমাদের দিকে মুখ করে। ঋজুদার সারা গা-মাথায় রক্ত। মীর-জাফরকে বয়ে এনেছে ঋজুদা একা-একা কতদূর কে জানে? শাজাহান বুড়ো মীরজাফরের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে যে কী করুণ কান্না কাঁদছে—কী বলব।

আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ পরিবেশে বৃদ্ধ বাবার বুকের করুণ আর্তি মুঠো মুঠো করে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র থেকে আসা শোঁ-শোঁ হাওয়া।

শাজাহান মুখ তুলল—দেখি সাদা দাড়ি তার ছেলের রক্তে লাল হয়ে গেছে।

আমরা কাছে যেতেই ঋজুদা আমাকে খুব সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল, ইডিয়ট্।

রক্তাক্ত মৃতদেহের অংশবিশেষ সামনে নিয়ে তখন আমাদের, মানে জীবন্ত মানুষের নির্বিঘ্নে ফিরে-আসা নিয়ে আনন্দ করার পরিবেশ একেবারেই ছিল না।

শাজাহানকে ঋজুদা জিগ্যেস করল যে, যদি শাজাহান চায় তাহলে বোটে করে মীরজাফরকে ও শাজাহানকে পাঠিয়ে দেবে ওদের গাঁয়ে—ঋজুদা ও আমি থেকে যাব ওদের নৌকো দুটোতে যতক্ষণ না বোট ফিরে আসে। কারণ বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা

করতে হবে ঋজুদাকে কাল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই।

শাজাহান বলল, কী করতি নে যাব? ওর মাজান্ তার সাধের পুতের এই মুরতি দেইখ্যে ত' ভিরমি যাবে। তার চেয়ি ইখানেই আমার বাজানকে কবর দে যাই। একটা বড় সুন্দর গাছ দেখো তুমরা সক্কলে। তার নীচে শুইয়ে দে যাই। যখনই আইসব আবার, যতদিন বাঁচি, গাছটারে দেইখ্যে যাব একবার কইরে—বাতি দে যাব পেরতিবার তার কবরে।

কাল সকাল অবধি মীরজাফরের মৃতদেহ অমনভাবে ফেলে রাখা যাবে না। পচন ধরবে। তাই ঋজুদা বোট এবং নৌকোর সক্কলকে নেমে আসতে বলল মাটি খোঁড়ার মতো কোদাল, শাবল এবং অন্য যা কিছু আছে সব নিয়ে।

আমাকে বলল, বন্দুক রেখে আমার ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা নিয়ে আয়। আরেকটা টর্চও।

তারপর আমি আর ঋজুদা যে বড় কেওড়া গাছের তলায় কবর খোঁড়া হবে বলে ঠিক হল, তার দুপাশে অন্য দুটো বড় গাছে হেলান দিয়ে রাইফেল হাতে করে দাঁড়ালাম। আমি ঋজুদার থ্রি-সিক্সটি-সিক্স রাইফেলটা নিয়েছি। নেওয়ার আগে রুমাল দিয়ে যতখানি পারি রক্ত মুছে নিয়েছিলাম। তবুও চট্ চট্ করছিল।

বোট থেকে পরেশ একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে এনেছে। সেটা ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে খপাখপ্ মাটি খুঁড়ছে।

ঋজুদা পরেশকে বলল, অনেকখানি খুঁড়তে হবে রে। নইলে আজ নয় কাল বাঘে খুঁড়ে বের করে নেবে।

নিচু গলায় বলল, যাতে শাজাহান শুনতে না পায়।

কবর খোঁড়া হয়ে গেল এক ঘণ্টার মধ্যে। সকলে মিলে হাত

লাগাতেই তা হল। নীলমণি সারেঙ পর্যন্ত হাত লাগিয়েছিল। শুধু শাজাহানই বসে বসে দেখছিল। ওর শরীরে মনে বল ছিল না।

তারপর ওরা কোরান থেকে কী সব আবৃত্তি করল। ঋজুদা বোট থেকে তার একটা নতুন ভাগলপুরি চাদর বের করে আনতে বলল গদাধরকে। সেই চাদরে ওডিকোলন ঢেলে তাতে মীরজাফরকে শোওয়ানো হল। মীরজাফরের মুখটা তেমনিই সুন্দর আছে। মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। মাথার চুল পড়েছে এসে মুখের এক পাশে। যেন ঘুমিয়ে আছে ছেলেটা। ঘুমের মধ্যে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে যেন।

সকলে মিলে হাত লাগিয়ে মীরজাফরকে কবরে নামিয়ে দিল ওরা। তারপর মাটি চাপা দিল। প্রথমে সকলে হাতে করে মাটি দিল। পরে কোদাল দিয়ে।

কবর দেওয়া শেষ হলে একটা হ্যারিকেনে তেল ভরে সেইটে কবরের উপরে রেখে দিতে বলল ঋজুদা।

তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এসে বোটে ও নৌকোয় উঠলাম আমরা এক এক করে। ফিরে আসার সময় আমি আর ঋজুদা জঙ্গলের দিকে মুখ করে পিছু হেঁটে এলাম। যখন ফিরছি, তখন ট্যাকের ঘাসিবনে চিতল হরিণের ঝাঁক টাঁউ-টাঁউ, টিঁউ করে ডেকে ফিরছিল। জোয়ার তখন ভরা। নদীনালা টইটম্বুর। একফালি চাঁদ উঠেছে। পাণ্ডুর।

ঋজুদা চান করতে গেল। সারাদিন কিছুই খায়নি বলতে গেলে। গদাধর সকলের জন্যেই রাতে খিচুড়ির বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, তাড়াতাড়ি খিচুড়ি চাপিয়ে দিল ও।

সবীরকে আমি শুধোলাম, গাছের উপর থেকে যে সাপটা নীচে ফেললে তখন, সেটা কী সাপ?

কে জানে কী জাত? বজ্জাত সাপ হবি। ফোঁস করে ফণা তুলছিল। সাপের পো আমাকে চেনে না। আমার বাবা ছেল সাপুড়ে, কত সাপের বিষদাঁত ভেইঙেছে সে। এমনভাবে লেজ ধইরে হ্যাঁচ্‌কা টেনে ছুঁইড়ে দিলাম যে, পড়তে পথ পায় না।

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, বিষ ছিল?

ছেলনি? বিষধর না হলি কি ফণা ধইরতে পারে?

আমি বললাম, তুমি তো আচ্ছা লোক। আমার প্রায় ঘাড়ে ফেললে এই বিষধর সাপকে?

সবীর ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করল। তারপর জিভ কেটে বলল, এঃ! বড্ড অন্যায় হইয়ে গেছে তো, তুমাকে কাট্‌তি পারত যি, সি কথা খেয়াল ছেলনি।

ঋজুদা চান করে উঠে তাড়াতাড়ি দুমুঠো খেয়ে শুয়ে পড়লো। আমাকে বলল, শুয়ে পড়। কাল প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উঠে পড়ব। তারপর নেমে যাব। কাল মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আজ ভাল করে ঘুমো।

শোওয়ার আগে, ঋজুদা সকলকে সাবধানে থাকতে বলল। বোটে ও নৌকোয় হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখতে বলল সারা রাত।

কেবিনে আমি আর ঋজুদা পাশাপাশি। দুই বার্থে। নৌকো দুটো বোটের সঙ্গে বাঁধা। ওরা সকলেও তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ল।

ঋজুদা বলল, তোকে আমি আর কখনও শিকারে আনব না। তোকে নামতে মানা করা সত্ত্বেও তুই নামলি কেন নীচে?

আমি বললাম, কাল বলব। আজ তুমি ক্লান্ত; ঘুমোও।

তারপরই, না জিগ্যেস করে পারলাম না বলে, আমি শুধোলাম, কী হল? গুলির শব্দ শুনলাম যে।

ঋজুদা মন খারাপের গলায় বলল, কী যে হল, বুঝলাম না। হয় মিস্ করেছি, নয়ত গুলি বাঘের গায়ে লেগেছে, কিন্তু ভাইটাল্ জায়গায় নয়।

তারপর একটু থেমে বলল, আমি গিয়ে পৌঁছতেই দেখি, মীর-জাফরের ডান হাতটা কামড়ে কেটে নিয়ে ওর পাশে শুয়ে শুয়ে খাচ্ছে বাঘটা। প্রকাণ্ড বাঘ। আমাকে দেখেই-তো তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে মীরজাফরের শরীরটাকে তলায় নিয়ে বসে পড়ল মাথা নিচু করে। আমাকে দেখতে লাগল। ও আমার উপর লাফাতে যাবে আমি ঠিক সেই সময় গুলি করলাম। ও লাফানোর পর হয়তো গুলিটা হয়ে থাকবে। খুব সম্ভব চামড়া বা মাংস ঘষে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। আমি সামনে সটান শুয়ে পড়তেই আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়ে পড়ল হ্যাঁতালের ঝোপে, তারপর ঝোপ ঝাড় ভাঙতে ভাঙতে লাফাতে লাফাতে গভীর বনে চলে গিয়ে একবার গর্জন করল।

তোরা শুনেছিলি সে গর্জন ?

আমি বললাম, হ্যাঁ। সক্কলেই।

ঋজুদা আবার বলল, তখন আমার বাঘের পেছনে যাওয়ার সময় ছিল না। কী করে মীরজাফরকে এনে তার বাবার হাতে দিই সেই চিন্তাই তখন একমাত্র চিন্তা। লোডেড রাইফেল হাতে করে ওকে কাঁধে তুলে এক-পা এক-পা করে সাবধানে এগোই, তারপর একটু গিয়েই নামিয়ে রেখে দম নিই, চারপাশে ভাল করে দেখি, আবার এগোই। এইতেই এত সময় লেগে গেল।

আমি বললাম, ফোর-ফিফটি ফোর হাণ্ড্রেড রাইফেলটা নিয়ে গেলে না কেন? ঐ রাইফেলের গুলি গায়ে লাগলে বাছাধনের নড়তে হত না।

ঋজুদা বলল, নিলে হয়তো ভালই করতাম। কিন্তু ভাবলাম, কত

মাইল জঙ্গলে কাদায় চলতে হবে তা তো অজানা। অত ভারী রাইফেল বইতে অসুবিধা হবে। তাছাড়া গুলি লাগলে তবে ত!

আমি আবার জিগ্যেস করতে গেলাম, তাহলে···

ঋজুদা বলল, এখন আর কথা না। ঘুমিয়ে পড়।

প্রায় অন্ধকার থাকতে থাকতে স্টোভে চা করে আর তার সঙ্গে কুচো নিমকি দিয়ে গদাধর আমাদের তুলে দিল। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। ঋজুদা ফোর-ফিফটি ফোর-হাণ্ড্রেড রাইফেলটা নিল, আমাকে দিল থ্রি সিক্সটি-সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটা।

বোট থেকে নেমে ম্যাগাজিনে চারটি গুলি ভরে বোল্টটা টেনে চেম্বারে একটা দিয়ে সেফ্‌টি ক্যাচটা ঠেলে দিলাম।

কাল যেখানে গুলি করেছিল ঋজুদা বাঘটাকে, খুব সাবধানে সেখান অবধি গিয়ে পৌঁছতেই সাড়ে-সাতটা বেজে গেল।

রোদ উঠে গেছে। ঘাসে পাতায় জমিতে যেখানে যেখানে শিশির পড়ে ভিজে রয়েছে সেই শিশিরে রোদ পড়ে ঝলমল করতে লাগল। নানারকম রঙিন পোকা, কাঁকড়া সব এদিকে ওদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা মাছরাঙা পাখি রাতের আবাস ছেড়ে খালের দিকে উড়ে গেল অদ্ভুত স্বরে ডাকতে ডাকতে। এই সকালে কোনো অঘটন ঘটবে বোধহয়। পাখিটার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল যা কখনও আগে লক্ষ্য করিনি।

আমরা বাঘের রক্তের হদিস পেলাম। পাতায় পাতায় রক্ত লেগে শুকিয়ে আছে।

ঋজুদা আগে আগে, আমি ঋজুদার হাত দশেক পিছনে। ঋজুদা রক্ত দেখে দেখে এগোচ্ছে, আমি চারপাশ ও পিছনে তাকাতে তাকাতে।

ঘণ্টাখানেক এগোনোর পর, আশ্চর্য! দেখি, বাঘটা সমুদ্রের মোহনার বালিতে নেমে গেছে। যেখানে নেমেছে, সেখানে বালিতে একটা খুব বড় কুমিরের গা ও পায়ের দাগ দেখলাম।

ঋজুদা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কী রে? আহত বাঘ কি শেষে কুমিরের পেটে গেল?

ঠিক সেই সময় প্রকাণ্ড কুমিরটা জল ছেড়ে আমাদের দিকে মুখ করে ডাঙায় জাগল। কুমির মারার পারমিট ছিল না আমাদের। তাছাড়া ঐ সময় আহত বাঘটা ছাড়া অন্য কোনো-কিছুতে আমাদের

আগ্রহও ছিল না।

ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি সরে আয়। প্রকাণ্ড কুমির। সাহস দেখেছিস? ডাঙায় উঠে মানুষ নেওয়ার মতলব।

আমরা তাড়াতাড়ি জঙ্গলের দিকে সরে এসে আবার রক্তের দাগ দেখতে লাগলাম। মিনিট পনেরো এদিক-ওদিক ঘুরে আবার পাওয়া গেল দাগ। বাঘটার বোধহয় পিপাসা পেয়েছিল। নোনা জলই খেয়েছিল। এখানকার বাঘ তো নোনা জলই খায়। কেন এদিকে এসেছিল কে জানে? ঋজুদাকে নজর করার জন্যেও এসে থাকতে পারে।

পায়ের দাগে বোঝা গেল, সে মুখ ফিরিয়ে আবার জঙ্গলেই ঢুকেছে। সাদাবানী, গেঁয়ো, গরান, হ্যাঁতাল কম এখানে। হ্যাঁতাল যেন জলের কাছেই বেশি হয়। গোলপাতাও। এদিকে বড় বড় কেওড়া গাছ, সুন্দ্‌রী, কাঠপুত্‌লি লতা, ঝাল্‌কাসুন্দির ঝাড়, ওড়া।

আস্তে আস্তে রক্তের দাগ ট্যাঁকের দিকে এগোতে লাগল। কাল আমি আর সবীর যেখানে গিয়েছিলাম। তখনও ট্যাঁকটা প্রায় দু ফার্লং মতো দূরে।

৭

হরিণ ডাকতে লাগল খুব জোরে জোরে ওদিক থেকে। বাঁদিক থেকে বাঁদরগুলো প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে দিল হুপ্ হুপ্ করে। ট্যাকটার কাছাকাছি পৌঁছে ঋজুদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রুদ্র, খুব সাবধান। এবার আর আগে পিছে নয়। তুই এখানে দাঁড়া, আমি একটু গাছে উঠে দেখি।

তারপর নিজের মনেই বলল, তোকে আজও না আনলেই ভাল হত।

আমি রাইফেল রেডি-পজিশানে নিয়ে দাঁড়ালাম। ঋজুদা জুতোটা খুলে রাইফেল হাতেই তর্ তর্ করে গাছে উঠে গেল। গাছে উঠেই কী যেন দেখতে পেয়েই রাইফেল তুলল সেদিকে। তখনও হাঁফাচ্ছিল ঋজুদা। ব্যাপারটা কী বোঝার আগেই গুড়ুম করে শব্দ হল। একটা মোটা ডালে রাইফেল রেস্ট করে রেখে গুলি করল ঋজুদা।

আমি নীচে দাঁড়িয়ে সামনের ঝোপ ঝাড়ের জন্যে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিছুই। গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মনে হল গাছপালা সব বাঘের গর্জনে গুঁড়িয়ে যাবে। সে যে কী গর্জন তা নিজের কানে না শুনলে বোঝা যায় না। গর্জনটা আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিকে একটু এগিয়ে এসেই থেমে গেল।

ঋজুদা আরও কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল। তখন আমার ঋজুদার দিকে তাকাবার অবসর ছিল না। সামনে গুলি খাওয়া বাঘ। টেন্স্ হয়ে সামনে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি রাইফেল রেডি রেখে।

ঋজুদা গাছ থেকে নেমে ফিস্‌ফিস্ করে বিরক্তির গলায় বলল, নাঃ! ওয়ার্থলেস্। শিকার ছেড়ে দেব আমি। এমন ফিজিক্যালি আন্‌ফিট্ হয়ে গেছি না! গাছে উঠতেই হাঁপিয়ে গেলাম। কচ্ছপের মতো মোটা হয়ে গেছি।

আমি বললাম, গুলি কোথায় লেগেছে?

ঋজুদা রাইফেলের ব্রীচ খুলে এম্প্‌টি কার্টিজটা ফেলে নতুন গুলি ভরছিল। সফট্-নোজড্ বুলেট।

ফিসফিস করেই বলল, বাঘের পায়ের সামনে, মাটিতে পড়েছে গুলি। তারপর বলল, বাঘ এখন সাক্ষাৎ যম হয়ে রয়েছে। কালকের গুলি বুক আর পেটের মধ্যিখানে পাঁজরে লেগেছে। পেটে

ভীষণ যন্ত্রণা, কিন্তু মেরুদণ্ড ও সামনের ও পিছনের পায়ের সব জোরই আছে। বেচারাকেও কষ্ট দেওয়া হল, আমাদের ঝুঁকি বাড়ল অনেক।

তারপর বলল, এইবারেই চার্জ কেন করল না বুঝলাম না।

আমি বললাম, বাঘটা গেল কোনদিকে?

তাই তো দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না। একটু এগিয়ে এসে ঘন আণ্ডারগ্রোথে লুকিয়ে গেল। তারপর আড়ালে আড়ালে যে কোন্‌দিকে গেল দেখা গেল না।

একটু থেমে বলল, এবারে কিন্তু খুউব সাবধানে এগোবি।

আরও কিছু দূরে ডানদিকে গিয়ে আমরা ট্যাঁকের দিকে এগোতে লাগলাম। যাতে বাঘের মুখোমুখি না পড়ি। ঋজুদা চাইছিল পাশ থেকে বাঘকে পেতে, যদি ব্রড-সাইড্ শট্ পায় একটা।

ট্যাঁকের কাছাকাছি আসতেই মনে হল যেন শ্মশানে এসেছি। পাখি নেই, প্রজাপতি নেই, পোকামাকড়, বাঁদর, হরিণ কিছুই নেই। নিথর নিস্তব্ধতা। কেবল মোহনার কাছে দূরের চরে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ।

একটা সুঁতিখাল নেমে এসেছে ট্যাঁক থেকে। চলে গেছে, আমরা যেখানে পরশু রাতে নোঙর করেছিলাম সেদিকে।

ঋজুদা আমাকে বলল, তুই এই বাঁ খালের পাড় ধরে এগো রুদ্র, খুব সাবধানে। আমি ট্যাঁকের দিকে যাচ্ছি। যদি আমাকে দেখে এই খালে নামে বাঘ, তবে তোর দিকে আসবে। দেখা মাত্রই গুলি করবি। সময় দিবি না একটুও। তাতে যদি ভাইটাল জায়গায় না লাগে নাই-ই লাগল। রিপিট করবি সঙ্গে সঙ্গে! বাঘ একটু সময় পেলেই আমাদের ভীষণ মুশকিল হয়ে যাবে।

আমি বললাম, আচ্ছা!

ঋজুদা যাওয়ার আগে আমার কাঁধে বাঁ হাত দিয়ে চাপ দিল। বলল, ওয়াচ আউট্। অ্যাণ্ড গুড লাক্।

এবার আমি একা। উত্তেজনায় রাইফেলের কুঁদোয় রাখা আমার ডান হাতের তালু ঘেমে উঠেছে। এরকম সাঙ্ঘাতিক পরিবেশে এর আগে ঋজুদা কখনও আমাকে একা ছাড়েনি। আজকে ঋজুদার সঙ্গে আমার চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ আর কেউই নেই। তাছাড়া আমার প্রচণ্ড উৎসাহও হয়তো আর একটা কারণ।

সুঁতিখালের পাড়ে পাড়ে এক-এক পা করে আমি এগোচ্ছি। খালের মধ্যে এবং দু পাড়ে দেখতে দেখতে। এখন আর ঋজুদাকে দেখা যাচ্ছে না।

ভাঁটি দিয়েছে। ছোট ছোট রূপোলি মাছ লাফাতে লাফাতে জলের তোড়ে নেমে আসছে খাল বেয়ে।

খালের সঙ্গে সঙ্গে বাঁক নিতেই একটা অতর্কিত আওয়াজে চমকে উঠলাম। একটা বিরাট বড় মাছরাঙা—নীল আর লাল—মাছ ধরছিল খালপাড়ে বসে। হঠাৎ কেন যেন ভয় পেয়ে চিৎকার করে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে।

আমার বুকের ভেতরটা ধক্ ধক্ করে উঠল।

একটু একটু করে সাবধানে এগোচ্ছিলাম। কতক্ষণ কেটে গেছে! কে জানে? পনেরো মিনিট না আধঘণ্টা? গাছের পাতার দিকে চেয়ে দেখলাম হাওয়াটা কোন্ দিক থেকে বইছে? আমার সামনের দিক দিয়েই আসছে হাওয়াটা। মাঝে মাঝে তাই পিছনদিক ও দু পাশটা দেখে যেতে লাগলাম।

আর একটু এগোতেই হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল। সুঁতিখালের ভাঁটি-দেওয়া জল তখন চার ইঞ্চি মতো আছে। সেই

নেমে যাওয়া জলে, উপর থেকে রক্ত মিশে আসছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রাইফেলটা কাঁধে লাগিয়ে, সেফটি ক্যাচ অন করে খুব আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে এগোতে লাগলাম। এবারে জলটা আরও লাল। কিসের রক্ত ধুয়ে আসছে?

সামনেই নালাটা বাঁক নিয়েছে আর-একটা। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে লাগলাম এবারে। বাঁকের মুখে এসেই দেখি একটা উটের সমান বড় বাঘ জলের মধ্যে সোজা হয়ে বসে আছে।

বাঘটা ট্যাকের দিকে মুখ করে নিবিষ্টমনে চেয়ে আছে। ঋজুদাকে দেখেছে বোধহয় অথবা শুনেছে তার পায়ের শব্দ। আমার দিকে শরীরের বাঁ পাশটা। লেজটা জল ছাড়িয়ে ভাঁটি-দেওয়া খালের নরম কাদায় নোয়ানো আছে। কাদায়, জলে, রক্তে বাঘটা মাখামাখি হয়ে গেছে। চারটে পাঁচনম্বরি ফুটবলের মতো গোল মাথাটা। এত বড়! বাঘটার পেটটা ওঠানামা করছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে।

আমার বুকটা এত ধক্ ধক্ করতে লাগল যে, মনে হল আমি হার্ট-ফেল করব।

তারপর চুল চুল করে রাইফেলের নলটা ঘুরিয়ে অনেক যত্নে এইম্ করলাম। আমার মন বলছিল যে, এত কাছ থেকে আমি যদি মিস্ করি, তো বাঘ আমাকে কইমাছের মতোই চিবিয়ে খাবে।

আমি বাঘের বুকের বাঁদিকে এইম্ নিলাম। তারপর যত শক্ত করে পারি রাইফেলটাকে ধরলাম। হোল্ডিং ভাল না হলে কখনও এইম্ ঠিক হয় না। কখন যে ট্রিগারে ফার্স্ট প্রেশার অনুভব করলাম আমি নিজেও জানি না।

হঠাৎ যেন আমার অজান্তেই গুলিটা শব্দ করে বেরিয়ে গেল।

বাঘটা সোজা একটা লাফ দিয়ে উঠল; একেবারে সোজা বোধহয়

হাত পনেরো কুড়ি হবে, তারপর ঝপাং করে পড়ল এসে খালের জলে, নরম কাদায়। এবার ওর মুখ আমার দিকে। বাঘটা সমস্ত শরীরটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল, লেজটা একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ফেলতে লাগল শক্ত লাঠির মতো করে। নরম কাদায় লেজের বাড়ির শব্দ হচ্ছিল পত্ পত্ করে।

কখন যে রিলোড করেছিলাম আমার মনে নেই। বোধহয় রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শানে। বাঘটা লাফিয়ে ওঠার আগেই আবার গুলি করলাম। এবারে গুলিটা গিয়ে লাগল ঘাড়ে। বাঘটা ঐরকম লাফাতে-যাওয়া অবস্থাতেই থরথর থরথর কাঁপতে লাগল। তারপর, জানি না কতক্ষণ পরে—ওর মাথাটা সামনের দু পায়ের থাবার উপর এবং কাদার মধ্যে নুয়ে এল।

আমি ততক্ষণে বাঘটার দিকে চেয়ে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু যে আছে—আমিও যে আছি—তাও আমার খেয়াল ছিল না তখন।

ঘোর ভাঙল, প্রথমে একটা লম্বা ছায়া দেখে। ছায়াটা পড়ল খালের মধ্যে আড়াআড়ি। তারপর ঋজুদার গলার স্বরে।

ঋজুদা খালের অন্য পাড়ে বাঘটার ঠিক মাথার উপরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাইফেলটা কাঁধে তুলে, ব্যারেলটাকে বাঘের দিকে করে।

ঋজুদা বলল, রুদ্র, সেফটি-ক্যাচ্ অফ্ করে নে।

আমি সেফটি-ক্যাচ্ অফ্ করে, ট্রিগার থেকে আঙুল সরিয়ে ব্যারেল ধরে রাইফেলটাকে কাঁধে ফেললাম।

ঋজুদা সুঁতিখালে নেমে, লাফিয়ে খালটা পার হয়ে আমার দিকে দৌড়ে এগিয়ে এল। মুখময় হাসি। সে মুহূর্তে ঋজুদার মুখ দেখে মনে হল, বাঘটা আমি মারায় তার খুশির শেষ নেই। এরকম হাসি

শুধু ঋজুদাই হাসতে পারে।

রাইফেলটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ঋজুদা বলল, কন্‌গ্রাচুলেশনস্‌!

তারপর ঋজুদা তার শক্ত হাতের এক থাবায় আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিল।

আমি বললাম, ঋজুদা!

ঋজুদা বলল, এবার থেকে তোকে সব জায়গায় নিয়ে যাব রুদ্র, সব বিপদের মধ্যেই। তুই শিকারী হয়ে গেছিস। পুরোদস্তুর।

তারপর হঠাৎ উদাস গলায় বলল, গদাধর আর শাজাহান খুব খুশি হবে। চল্‌ আমরা বোটে ফিরি। কিছু খেয়ে, ওদের সকলকে নিয়ে বাঘটা স্কিন করার জন্যে আসা যাবে।

ফেরার সময়ও সাবধানে চারধারে চোখ রেখে হাঁটতে লাগলাম আমরা। এমন সময় ট্যাঁকের গভীর থেকে একটা বাঘ ক্রমান্বয়ে ডাকতে লাগল, খুব বিরক্তির গলায়।

ঋজুদা একবার ওদিকে তাকাল, তারপর জোরে জোরে পা চালাল।

বলল, বেচারা!

আমি বললাম, বেচারা কেন? গদাধরের বাবাকে ওরা খেল, তুমি বলছ বেচারা?

ঋজুদা বলল, এ রাজ্যটা তো ওদেরই। পৃথিবীর সবটুকুই কি মানুষের? ওদের মনের মতো থাকার জন্যে ওদেরও একটু শান্তি, স্বাধীনতা তো চাই। আমরা এই রাক্ষুসে মানুষরা—রাইফেল হাতে মানুষ, চাষী মানুষ, জেলে মানুষ, মউলে মানুষ, বাউলে মানুষ সবাইই তো ওদের ঘরে এসে ওদের ঘর থেকে ওদের তাড়াতে চাই। সমুদ্রে

ওদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় না করা পর্যন্ত শান্তি নেই বুঝি আমাদের।

সবটুকু পৃথিবীই যে আমরা মানুষরাই শুধু ভোগ করতে চাই একা একা, স্বার্থপরের মতো!

ওরা বেচারা নয় কি?

আমি চুপ করে রইলাম। কথা বললাম না কোনো।

দূর থেকে বোটের মাথাটা, সারেঙের কেবিনের সাদা-রঙা ছাদ দেখা যাচ্ছিল। ওরা সবাই সারবন্দী হয়ে ওপরের ডেকে দাঁড়িয়েছিল।

ডেকে শাজাহান বুড়ো হাঁটু গেড়ে বসে নমাজ পড়ছিল। নরম রোদে ওর নতজানু ভঙ্গি, সাদা বুক-অবধি দাড়ি, আর বাদামি চেহারা দেখে দূর থেকে মনে হচ্ছিল, ও যেন কোনো দূরলোকের যাত্রী।

ওর জন্যে আমার বুকের মধ্যেটা হঠাৎ কেমন মুচড়ে উঠল।

অন্যরা সকলে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল সারবন্দী, চিন্তান্বিত মুখে।

বাঘটা কে মারল, কেমন করে মারা হল; এ সব নিয়ে ওদের কারোই আর কোনো উৎসাহ ছিলো না।

শুধু গদাধর বোট আর ডাঙ্গার মধ্যে লাগানো কাঠের তক্তাটা বেয়ে দৌড়ে এল আমাদের দিকে।

বোটের দিকে হেঁটে চললাম ঋজুদার সঙ্গে আমি।

—